বিরূপাক্ষের নিদারুণ অভিজ্ঞতা

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বর্ণিত

দি বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ

২৫।২, মোহনবাগান রো

কলিকাতা – ৪

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ ১৩৫৯

প্রকাশক ঃ

শ্রীশক্তিকুমার ভাদুড়ী
দি বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ
২৫।২, মোহনবাগান রো
কলিকাতা—৪

মুদ্রাকর ঃ

গিরীন্দ্রনাথ সিংহ, দি প্রিন্টিং হাউস,
২০, কালীদাস সিংহ লেন
কলিকাতা—৯

চিত্রাঙ্কণ ঃ

শ্রীরেবতীভূষণ ঘে
ও
প্রমথ সমাদ্দার

প্রচ্ছদপট

খালেদ চৌধুরী

ব্লক নির্মাণ ও মুদ্রণ
দি স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা

বাঁধাই
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৬১।১, মির্জাপুর স্ট্রীট
কলিকাতা

মূল্য—তিনটাকা বারআনা মাত্র

আমার চিরদিনের পৃষ্ঠপোষক

ভারতের শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ্ ও সাহিত্যিক

স্যার যদুনাথ সরকার

শ্রদ্ধাষ্পদেষু

—প্রণত:

শ্রীবিরূপাক্ষ।

নিবেদন

আমার চতুর্থ পুস্তক 'নিদারুণ অভিজ্ঞতা' প্রকাশিত হল। এই বাজারে বই বার ক'রে অশান্তি আরও বাড়ে, তবু যখন সব লেখকই নাছোড়বান্দা হয়ে বই বার কর্চ্ছেন তখন আমিই বা পিছিয়ে থাকি কেন, সেই মনোভাবের বশবর্তী হয়েই 'নিদারুণ অভিজ্ঞতা' বার করলুম। বাংলা দেশের লেখকদের একে দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই তার ওপর এ ধরণের বই, না-নাটক, না সিনেমার প্লট, না উপন্যাস, না গল্প—এসব লিখে পেটত চলেই না উপরন্তু দেনা হয়। তবু 'বিহার সাহিত্য-ভবনে'র শ্রীমান্ শক্তি ভাদুড়ীর উৎসাহের অন্ত নেই এই ধরণের বই বার করার। তারুণ্যের শক্তি একটা না একটা ফাঁক দিয়ে ত বেরোবেই—তিনি বই বার কর্চ্ছেন, লোকে 'কিউ' দিয়ে বই চেয়েনিয়ে যাচ্ছে, দাম দেব দেব ক'রে অনেকে দিচ্ছে না, আবার অনেকে দামের কথাও বলছে না, শুধু দাঁত বার ক'রে 'বেড়ে বইখানা ছেপেছ ত হে,' বলে নমুনা হিসেবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সংসারে গ্রন্থকার ও প্রকাশক-দের শত্রু থাকা ভাল কিন্তু বন্ধু থাকলে সর্বনাশ! মানুষের নির্লজ্জ বেহায়াপানা এঁদের মাধ্যমে যা প্রকাশ পায় তা আর কিছুতে পাওয়া যায় না। অথচ না-দিলে গালাগালির

অন্ত নেই! বাজারের এই অবস্থা! যাই হ'ক, তবু দু' চারজন বই নগদ কেনেন এইটুকুই আমাদের লাভ! প্রেসের ও কাগজ কেনার দেনা মেটে।

নিদারুণ অভিজ্ঞতার অনেকগুলি বেতারে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র পড়েছিলেন এবং এর প্রায় শতকরা নিরানব্বইটি প্রবন্ধ দেশ পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল। এ বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার সুদক্ষ কর্মী বন্ধুবর কানাই সরকার, সাগরময় ঘোষ, জ্যোতিষবাবু প্রভৃতি আমাকে যে ভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং পুস্তক মুদ্রণে বহুদিক দিয়ে যে ভাবে সাহায্য করেছেন তার জন্যে আমি তাঁদের প্রত্যেকের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এ ছাড়া আমাকে স্বপ্নে যিনি এই বইটির বিষয় কিছু লিখে দিয়ে স্বর্গলোক থেকে সাহায্য পাঠিয়েছেন সেই চিরস্মরণীয় স্বর্গীয় কমলাকান্তকেও সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ইতি

শ্রীবিরূপাক্ষ

ভূমিকা নয় পরিশিষ্ট

স্বর্গীয় কমলাকান্ত দেবশর্মণঃ

(স্বপ্নে প্রাপ্ত)

মন্দার পর্বতের মলয়ানিল সেবিত এক নিভৃতগিরিকন্দরে—ভরিখানেক আফিঙ্ খাইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে পরম আরামে ঝিমাইতেছিলাম। সম্মুখে মন্দাকিনীর কুলুকুলু ধ্বনি, পর্বতের সানুদেশে বিবিধ কুসুমের বিচিত্র সমারোহ, পর্বতশৃঙ্গে তুষার ও মেঘের অপরূপ শুভ্র মিলন, চতুর্দিকের ঘনস্তব্ধতা আমার মনকে ভুলাইয়া যেন আর এক মোহনীয় স্বর্গরাজ্যে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। ভাবিতেছিলাম, যে যাহাই বলুক স্বর্গের মাধুর্য্য সাদা চোখে ঠিক অনুভব করা যায় না, একটু নেশা করিতেই হয়। তাও যে-সে নেশায় চলেনা। নেশার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, প্রাচ্য সংস্কৃতির ও শান্তির অগ্রদূত, হৃদয়মনমন্থনকারী অপরূপ ঐন্দ্রজালিক বটিকা—এই অহিফেন না খাইলে চলেনা।

বিনা আফিঙে স্বর্গের রূঢ় স্থূলতা মনকে আঘাত করে—মনে হয় যাহা ভাবিয়াছিলাম এত তাহা নয়, কিন্তু যেই এক মাত্রা কালচাঁদ জিহ্বায় ঠেকিল অমনি সমস্ত রূপ যেন বদলাইয়া গেল। স্বর্গ সত্যকারের স্বর্গ হইয়া উঠিল!

বেশ ভুলিয়াছিলাম। সহসা অতিদূর হইতে কাহার আর্তনাদ ভাসিয়া আসিল—কাণ খাড়া করিয়া শুনিলাম ঠিক আর্তনাদ নয়, আমার নাম করিয়া ঘুমের ঘোরে বিরূপাক্ষ হাত-পা ছুঁড়িয়া চেঁচাইতেছে। স্বর লক্ষ্য করিয়া স্বপ্নের সরণি পার হইয়া তাহার মনের মাঝে গিয়া হাজির হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, বৎস, কি চাও ?

সে বলিল, মহাশয়, আমায় একটা ভূমিকা লিখিয়া দিতে পারেন ? আমার পার্থিব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধীয় একখানি বই বাহির করিতেছি কিন্তু পুস্তকের ভূমিকা লিখিবার লোক পাইতেছি না।

আমি বলিলাম, বংস তোমার জীবনের অভিজ্ঞতাই ত আসল ভূমিকা, বাকী যেটুকু আছে তাহা পরিশিষ্ট, সেটুকু লিখিয়া দিতে বল, দিতে পারি। সে তাহাতেই রাজী হইয়া গেল।

বলিলাম, বাপু হে, মর্ত্যজীবনে যেটুকু অভিজ্ঞতা মানুষের সান্নিধ্যে লাভ করিয়াছ তাহাই ভাল, এখনও দেবতা-দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়া বাঁচিয়া গিয়াছ। কারণ, এখানে এত ভাল ভাল লোক আসিয়াছেন, যাঁহাদের ঠেলায় আমাকে গুহাবাসী হইতে হইয়াছে। ইন্দ্রের প্রাসাদে সেই চেঁচামেচি, সেই পার্টি পলিটিক্স্, সেই ভোটাভুটি, সেই অপ্সরাদের ভারতীয় নৃত্য ও ফিল্ম্ সঙ্গীত, গন্ধর্বদের সেই দীর্ঘশ্বাসমার্কা আধুনিক গান, সেইপেজোমী, সেই হাড়হাবাতে-

গিরি পুরা মাত্রায় চলিতেছে বরং ক্ষমতা বেশি পাইয়া আরও কায়দা কানুন বাড়িয়াছে, অতএব বৎস, কোন ক্ষোভ করিও না—মর্ত্য লোকেই কোনমতে মাটী কামড়াইয়া পড়িয়া থাক, আনন্দ পাইবে।

তোমরা মর্ত্যের অধিবাসী, সংসারের জ্বালায় ফেচাখেউ হইয়া ভাবিতেছ মরিলেই হাড় জুড়াইবে কিন্তু তাহা জুড়ায় না। মানুষ মরিলেই ভদ্রলোক হইয়া যায়না, পৃথিবীর সকল সংস্কার ত্যাগ করে না, বরং ভূত হইয়া আরও জ্বালায়। আজ মরিয়া বুঝিয়াছি যে, স্বর্গ বলিয়া নূতন একটা স্থান আছে বটে কিন্তু তাহাতে নূতনত্ব নাই। আসলে মানুষের মনেই স্বর্গ, মনেই শান্তি! পৃথিবীতে বসিয়া যদি মন ভাল করিতে পার, বেশি গলা জড়াজড়ি করিয়া লোকের সহিত আত্মীয়তা না পাতাও, সুখী হইবে—মৃত্যুর পরেও নির্জনে বসিয়া আত্মচিন্তার সুযোগ মিলিবে নচেৎ এখানে আসিয়াও তুমি নিঝঞ্ঝাটে থাকিতে পারিবে না।

বিরূপাক্ষ মাথা চুলকাইয়া বলিল, সেই মনকেই যে ঠিক করিতে, পারিতেছি না, সংসারের জন্য, দেশের লোকের উন্নতির জন্য যে এখনও ভাবিয়া মরি।

আমি বলিলাম, তুমি মুর্খ, এসব কাজ করিবার জন্য কংগ্রেস আছে, কমিউনিস্টরা আছে, তুমি তাহা লইয়া মাথা ঘামাও কেন? তুমি সকলের চিন্তা ছাড়িয়া দাও—সুখী হইবে।

আহাম্মকের ভঙ্গীতে বিরূপাক্ষ আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিয়া উঠিল, বড় শক্ত!

আমি বলিলাম, মোটেই নয়। মনকে স্বর্গরাজ্যে উধাও করাইতে চাও ত' আফিঙ্‌ ধর। সংসারে বসিয়াই পরম নিশ্চিন্তে স্বর্গসুখ উপভোগ করিবে আর হা-হুতাশ করিতে হইবে না।

বিরূপাক্ষ আমার কথার তাৎপর্য বোধহয় বুঝিল। বলিল, খুব ভাল কথা বলিয়াছেন, এবারে আফিঙ্‌ই ধরিব। জ্বালা যদি বেশি বাড়ে তাহা হইলে মাত্রা বাড়াইয়া সটান আপনার পাশে গিয়া হাজির হইব। আপাততঃ পায়ের ধূলা দিন, আপনার চরম অভিজ্ঞতা মর্ত্যবাসীর নিকট প্রচার করি!

আমি বলিলাম, তথাস্তু!

ঘরের পাঁচালি

আমার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে জানবার জন্যে দেখলুম লোকের কৌতূহলের অন্ত নেই, কিন্তু কত বলবো? এই দুনিয়ায় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার মুখে জন্মে—এর মাঝামাঝি জায়গায় এসে, যে এইরকম গড়াগড়ি খেয়ে বে-ইজ্জত হ'তে হবে—এ ত ধারণার অতীত ছিল। জগত পরিবর্তনশীল—'হল্ট' করা তার রীতিবিরুদ্ধ, সবই বুঝি, কিন্তু তাই বলে একেবারে এইভাবে 'সামারসল্ট্' খেয়ে যাবে, এ কি আপনারাই কেউ আগে ধারণা করতে পেরেছিলেন? গরীবরা সংসারে এসে কোনদিনই সারবস্তু পায় না—পাবেও না, কিন্তু ভবপারে পৌঁছবার আগে চতুর্দিক থেকে অবিরত মার খেয়ে খেয়ে একেবারে কারবার ফতে ক'রে বসবে, এটাও যে ঘুণাক্ষরে আগে বুঝতে পারিনি।

বছর পঁচিশ তিরিশ আগে ভবিষ্যতের এই ছবিটা যদি কোন ফাঁকে একটু চোখ-মেরেও বিধাতা জানিয়ে দিতেন, তাহ'লে তখন আফিম সস্তা ছিল, ভরি দু'য়েক খেয়ে কোন্‌-কালে দেখতেন স্বর্গের জানলা দিয়ে (আপনাদের সেটা ঠিক পছন্দ না হ'লে, নয় নরকের ঘুল্‌ঘুলিতে দু'টি চক্ষু রেখে) আপনাদের সংসার করার রগড় দেখতুম।

সেকালে, বাবা পড়াশোনাটা একটু ভাল ক'রে করতে বলতেন, শুনিনি—কিন্তু তারপর বিয়ের টাইমে যেই তিনি প্রস্তাব ক'রে বসলেন যে এইবার একটি তোমার জন্যে বৌ আনছি, তখন খুব খুশী না-হয়ে উঠলেও, মনের মধ্যে এতদিনের পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য যে পাপ সঞ্চয় করেছিলুম তাই ক্ষয় করার বাসনায়, একেবারে তৎক্ষণাৎ সবিনয় নিবেদন হয়ে গেলুম। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি যে ভবিষ্যতে পাপ ক্ষয় করতে গিয়ে বাপ বাপ বলবার অবস্থা ঘটবে!

অভিজ্ঞতা অল্প ছিল, আর পাঁচটা দিকে একটু জোরও ছিল, তাই অতটা বুঝিনি—ভেবেছিলুম, গিন্নি আর আমি দিব্যি বল্‌ডান্স করতে করতে বেরিয়ে যাব, কিন্তু কে জানতো তারপর নো-ম্যানস ল্যাণ্ড থেকে পিল্‌পিল্ ক'রে ছানাপোনার দল এসে ভুলো-ধোনার ব্যবস্থা করবে।

কর্তারা ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক—দিব্যি হেসে খেলে কাটিয়ে গেলেন, ছেলেদের নড়া ধরে ধরে সংসারে ঢুকিয়ে দিলেন, কিন্তু ভাবলেন না—ভবিষ্যতে বেটাদের হবে কি!

আপনারা বলবেন, তাঁরা সব পুণ্যাত্মা ধার্মিক ছিলেন, তোমাদের মত অত প্যাঁচোয়া বুদ্ধি ছিল না, তাই অত বোঝেননি।

অস্বীকার করি না। কিন্তু ধর্মের মর্ম কোনকালে দু-একটি ভদ্রলোক ছাড়া কেউই বোঝেননি ব'লে আমার বিশ্বাস। ধর্মের গুরুরা পইপই ক'রে বলে গেছেন যে বাবা, কেলেঙ্কারীর রাস্তায় পা বাড়িও না, বিপদে পড়বে। তাকি তাঁরা শুনলেন? নিজেরা মহানন্দে কাড়া নাকাড়া বাজাতে বাজাতে ঝাড়া হাত-পা চলে গেলেন, কিন্তু আমাদের যা ব্যবস্থা ক'রে গেলেন, তাতে ফাঁড়া আর কাটে না। সর্বাঙ্গে ফোড়ার মত সংসারের সব-কিছু ফুলে আছে। ফাটেও না—বসেও না। এ কী নিদারুণ অবস্থা, ভেবে দেখুন!

জগতের যত বড় বড় ধর্মগুরু, তাঁরা দু-তিন হাজার বছর আগে থেকে ভবিষ্যতের এই অবস্থা হবে বুঝে, নিজেরা সংসার ছেড়ে দুদ্দাড় ক'রে পালিয়ে গিয়ে আদর্শ দেখিয়ে গেছেন কিন্তু সে আদর্শ মানলে কে? এখন শুধু ঘটা ক'রে হুজুগ করবার জন্যে লোকে তাঁদের এ্যানিভার্সারি করে। মানে না কেউ!

আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধদেব জীবের প্রতি দয়াবশতঃ না খেয়ে-দেয়ে কত ভাল-ভাল কথা বলে গেলেন, কিন্তু তারপরই দেখা গেল যে, তেমনি তেমনি জীব দেখলেই লোকের জিব্ দিয়ে জল ঝরতে শুরু করছে—পৃথিবী উজাড় হয়ে যায় আর কি! শঙ্করাচার্য স্ত্রী-পুত্রের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে 'কা তব কান্তা' ক'রে শোলোক রচনা করে গেলেন—যাতে করে ঢোলক বাজিয়ে গান করতে করতেও মানুষ সেগুলো আওড়ে মনে রাখে, কিন্তু আমরা তার পরিবর্তে কি করলুম? কান্তার হাতে হাতা-খোন্তা দিয়ে উনুনের পাশে বসিয়ে দিতেই তাঁরা মান্তাসা গড়িয়ে দেবার অর্ডার দিয়ে বসলেন, আর আমরা ভোর ছটায় উঠে পান্তা ভাত খেয়ে টাকা রোজগারের আশায় নিয়ত গলদ্ঘর্ম হয়ে মরতে শুরু করলুম!

এখন অবশ্য ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে তা হাড়ে হাড়ে বুঝছি কিন্তু বিপদ হচ্ছে এই যে যাঁদের নিয়ে ঘর করি, তাঁরা আবার এ বিষয়ের যে কাণাকড়ি বোঝেন না। এখনও তাঁদের সাধ ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌমার চাঁদমুখখানি দেখে যাবেন, মেয়েদের বিয়ে দিয়ে কাতিক জামাইদের নিয়ে সাধ-আহ্লাদ করবেন, নাতির মুখে ভাত দিয়ে তারপর সোয়ামীকে নিয়ে বৃন্দাবনের টিকিট কিনে বেরিয়ে পড়বেন। আক্কেলটা বুঝুন!

এই নিয়ে খেচাখেচির আর অন্ত নেই। আচ্ছা বলুন দেখি—নিজেরা ভুগছি, আবার জেনেশুনে ওদের গলায় পাথর

ঝোলাবো ? লোকের এখনও বংশরক্ষার বাতিক গেল না ? সারা পৃথিবীতে যে বংশ গজিয়েচে তার তাড়না সহ্য করতে না পেরে লোকে অস্থির-পঞ্চম হয়ে উঠছে—এসব দেখে শুনেও তবু হায়া নেই ? এক একটি বংশ কঞ্চি সমেত বাড়িতে রাখার যোগ্যতা আর যে আমার নেই, তা কেউ বুঝবে না ?

চোখের সামনে দেখছে, ন-বাবু বংশাবতংস হয়ে বসে আছেন—সবশুদ্ধ এগারোটি ছেলে-মেয়ে। খাটে জায়গা নেই, তাক ভর্তি, মেজেতে ঠাঁই হয় না, প্যাঁটকাগুলোকে মশারির চালে শুইয়ে রাখতে হয়। সেদিন আবার মশারীর একটা কোণা ছিঁড়ে তার থেকে গড়িয়ে পড়ে চিচিংয়েটার মাথা ফাটলো—রাতদুপুরে—কোথায় ডাক্তাররে, বদ্যিরে ক'রে ছুটে ছুটে সর্দিগর্মী হবার উপক্রম হ'ল—এসব দেখে শুনেও এদের চৈতন্য হয় না—সেইটেই আশ্চর্য !

বিয়ে না দিলে কি চলে ? যুক্তি কি ?—না, ছেলেপুলেদের বয়েস হয়েচে, বখে যাবে। বখা এ-বাজারে যেন অতি সোজা কথা ? এখন এধার-ওধার টোকা মেরে ফাঁকায় একটু ঘুরে বেড়ানো চলে, কিন্তু ঐ-সবের ঠেলা সামলাতে গেলে খোকাদের যে জিব্ বেরিয়ে পড়বে সেটা ত কেউ জানেন না ? বলে, তিনদিনে বাপ্ বাপ্ বলতে বলতে পালিয়ে এসে যদি বাড়িতে না ঢোকে তো কি বলেছি !

সত্যি কথা, এখন সংসার করতে পারে কারা ? যাদের চোরা কারবার কিম্বা যারা ব্যাঙ্কমার, নিতান্ত তা না হলেও

পকেটমার। না হলে এ জায়গায় বহাল তবিয়তে থাকা অসম্ভব !

যাক্, ছেলেদের বিয়ে আটকানো গেল, এল মেয়েদের বিয়ের তাগাদা। আচ্ছা, দিনকাল যা পড়েছে তাতে মেয়েরা নিজেরা যদি দেখে-শুনে ওরি মধ্যে বেছেবুছে কাউকে না ঠিক করে নিতে পারে, তাহ'লে বাপ-মার সাধ্যি আছে বিয়ে দেবার ? কতবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মেয়েগুলোকে বলেছি একটু চট্‌পটে হ' ! এখানে লাট্টুর মত ঘুরে, ওখানে একটাকে গাঁট্টা মেরে, একবার ঠোঁট ফুলিয়ে তার পরেই জিভ্ ভেংচে ছোটাছুটি কর্—এ বাজারে নেংচে চললে কারুর কোন আশা নেই—তা আমার কথা কেউ শোনে ? দিন-রাত হয় রান্নাঘরে ময়দা ঠেসছে, আর কাপড়ে ফুল তুলচে, নয় রেডিওর অনুরোধের আসর শুনতে শুনতে ফিলিমের গান মুখস্থ করছে।

সেদিন কেল্‌টিটা ছাতে চুল শুকোতে শুকোতে হঠাৎ দেখি হেঁচ্‌কি তুলতে তুলতে কি এক গান ধরেছে, আয়েগা—আয়েগা। ভাবলুম মাথাটা বিগড়েছে কিম্বা গরহজম হয়েচে, তা না হলে হিক্কা উঠবে কেন ?

গিন্নীকে জিগ্যেস করতে মারতে এলেন, বললেন, ওসব ফিলিমের গান তুমি কি জান ?

পাশের বাড়িতেও ঐ এক অবস্থা, সেদিন এক বন্ধুর বাড়িতে গেলুম ঐ এক রা—আয়েগা।

মনে মনে বললুম কোই নেহি আয়েগা বাবা—তোমাদের বাবারা যায়ে গা, জাল ফেলেগা—যথাসর্বস্ব খঁতম করেগা তবে আয়েগা, নইলে নয় ?

কিন্তু জাল ফেলিই বা কোথায় ? বাজারে ছেলে নেই—যা আছে তাও ছোঁবার জো নেই--এত দাম ! বাকী যা—তার অর্ধেক জিন্দাবাদ করতে করতে বেরিয়ে গেছে নয় সিনেমার হিরো হবার জন্যে চান্স খুঁজচে। এইরকম এক একটি কার্তিক ঘরে সেঁধুলে পৈত্রিক প্রাণটিও অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে কি না সন্দেহ !

দিনকাল সত্যিই খারাপ ! যাঁদের ভার আমার স্কন্ধে তাঁদের শেষপর্যন্ত যা হ'ক করে রেখে, ঘাট অবধি পৌছব কি না সে সম্বন্ধে প্রতিদিন সন্দেহ জাগছে ! জামা, কাপড়, খাবার টাকা কিচ্ছু নেই অথচ মনে করুন সংসার করছি—আপনাদের সঙ্গে ফুটবল খেলা দেখতে যাচ্ছি, হাসছি, ঘুরছি, ফিরছি, জন্মদিন থেকে শ্রাদ্ধদিন পর্যন্ত লৌকিকতা যুগিয়ে চলেছি, চাঁদা দিচ্ছি, সবই করছি---শুধু নিজেকে ঠিক রাখতে পারছি না। চতুর্দিকে অনন্ত কুযাসা—এর থেকে মুক্তির আশা কোথায় তার তো হদিস্ খুঁজে পাচ্ছি না।

একশো টাকা মাইনে পাই, সকলে মিলে চেঁচিয়ে মেচিয়ে পঁচিশ টাকা দুর্মূল্য ভাতা যোগ করিয়ে নেওয়া গেলো, সঙ্গে সঙ্গে বাজারের খাড়া যা দর হেঁকে বসলো তা শুনে মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠলো। অমন যে তুচ্ছ শাক পুঁই সেও তুই-মুই

করে গাল দিতে শুরু করে দিলে—এর ওপর রেশন আছে, মেয়েদের ফ্যাসান সামলাবার ধাক্কা আছে, সারা নেশনের উন্নতির কথা ভাববার জন্যে প্রত্যহ একখানি করে খবরের কাগজ আছে, কিন্তু আমার মত গরীব গেরস্থর নিশ্চিন্তে একটু ঠেশান দিয়ে অদৃষ্টের কথা ভাববার মত ঠাঁই কোথাও নেই।

অথচ আমি যে কি করি বুঝতে পারি না। পৃথিবীর সবার রাগ যেন আমার ওপর। বাড়ির সবার ধারণা—আমি দিব্যি আছি! ওঁর তো বাসন মাজতে হয় না, ন-টার সময় ভাত রেঁধে গেলাতে পেটাতে হয় না, তাহ'লে বুঝতেন কাকে বলে ঠ্যালা!

ছেলেদের ধারণা, বাবা তো একটা আহাম্মক! পাঁচটা ক্লাবে যায় না, খেলার খবর রাখে না, সিনেমায় কোন্ হিরোয়িনের জন্যে কারা হায় হায় করে বুক চাপড়ায় সে খোঁজ রাখে না—ওঁর তো হয়ে এসেছে!

মেয়েদের ধারণা—আমি একটা আস্ত উজ্‌বুক! তা না হলে আজকালকার দিনে কেউ চটের থলির মত সস্তায় কাপড় নিয়ে আসে? নেল্ পলিশে কি রং লাগে জানে না? ফেস্ পাউডার আর ডাস্ট পাউডারের পার্থক্য বোঝে না? ভুরু কামালে কি স্টিক পেন্সিল দিয়ে আঁকতে হয় সে সব মাথায় ঢোকে না?

প্রতিবেশীদের ধারণা—আমি চামার, তা না হলে চার আনার বেশী চাঁদা চাইলে তিনবার মাথা চুলকোই!

বন্ধুবান্ধবদের ধারণা—আমি একটা নিরেট বোকা, ওয়েস্ট্ ইণ্ডিজদের কোন্ বোলার বলের পিচ্ ওঠায় তা জানি না—পাড়ার রকে বুড়োদের ধারণা যে, আমাদের ফরেন্ পলিসিতে যে সব ভুল হচ্চে তা আমি বুঝতে পারি না—কংগ্রেসের ধারণা আমি গঠনমূলক কোন কাজ করতে পারিনা শুধু টিপ্পনী কাটি, কম্যুনিস্টদের ধারণা আমি প্রতিক্রিয়াশীল, আমার জন্যেই সব আটকে আছে—হিন্দু মহাসভার ধারণা আমি অপদার্থ কারণ এপর্যন্ত একটি মুসলমানেরও দাড়ি ছিঁড়তে পারিনি—মুসলমানদের ধারণা যেহেতু আমি হিন্দু সেইহেতু সর্ব শক্তিমান খোদাতালা আমায় সৃষ্টি করেননি, তাঁর কোন ডেপুটি বোধহয় সৃষ্টি করেছে, তাই আমি পাজী—আত্মীয় স্বজনের ধারণা আমি একাল-ষেঁড়ে, শুধু নিজের নিয়েই আছি—একবার ভুলেও তো তাঁদের বাড়ি কোনদিন বাজার করে দিযে আসি না।

ভায়েদের ধারণা, আমি চাপা, বেশ দু' পয়সা করেছি—ইনকম্‌টেক্সের কর্তাদের ধারণা, ব্যাঙ্কে না হলেও হয়তো ছাতের ট্যাঙ্কের মধ্যে আমার টাকা আছে—পেনালটি দিয়ে উস্থুল করে নেওয়া যাবে—উকীল বন্ধুদের ধারণা আমি একেবারে হাঁদাকান্ত, তা না হলে মামলায় জিত থাকতেও কোর্টে একটা নালিশ করি না—পুলিশের ধারণা, আমি চোর আর সর্বদাই আইন শৃঙ্খলার বিরোধী—স্ত্রীর ধারণা আমি তাঁকে ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত স্ত্রীলোককে পছন্দ করি—শত্রুদের

ধারণা আমি মদ খাই, রাত্তিরে বাড়ি ফিরি না—আপিসে বড়বাবুর ধারণা, আমি একেবারে অপদার্থ, তিনিই একা সব চালাচ্ছেন আর আমি বসে বসে পান চিবুচ্ছি।

কেবল ডাক্তার-বাবুরা জানেন আমি ভাল লোক। কারণ একমাত্র বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁদের খিদ্‌মদ্‌গারি করতে সর্বদা হাজির আছি। বাজারে যত রকম ওষুধ বেরিয়েছে সব চালান করার একটা প্রশস্ত রাস্তা তাঁরা আমার বাড়িতে খুঁজে পেয়েছেন—এবার ভাবছি সব কটা ওষুধ—বাতের মালিশ থেকে আরম্ভ ক'রে সর্দির মিকশ্চার পর্যন্ত মিশিয়ে আমি নিজেই একদিন খেয়ে ফেলবো—দেখি, তাতে আমার ভবব্যাধি সারে কি না! ঐ অভিজ্ঞতাটুকু অর্জিত হ'লেই সব শেষ হয়!

নিন্দের চোট

পৃথিবীতে এসে জন্মদিন থেকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত মানুষের আর অভিজ্ঞতার অন্ত থাকে না। আমার জীবনে বরাতের ফেরে কিন্তু মধুর অভিজ্ঞতা কিছুতেই হল না, চিরদিনই তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে একেবারে নাজেহাল হয়ে যেতে হ'ল।

বাল্যকালে আমার ধারণা ছিল পৃথিবীতে বোধ হয় আমার মত লোককে কেউ হু'চক্ষে দেখতে পারে না, তাই এত গাল খেয়ে মরি, নিশ্চয় এটা কোন গ্রহ-নক্ষত্রের ফল, কিন্তু ক্রমশঃ বুঝছি যে নাঃ! পৃথিবীটাই এমন গোলমেলে যে এখানে কেউ কাউকেই দেখতে পারে না—বিশেষ ক'রে এদেশে তো নয়ই। যে যা-করুক ঠিক তার পেছনে ভুরু ভিরকুটে প্রকাণ্ড একদল নিন্দেকুটে বসে আছে। এঁদের হাত থেকে গৃহজীবনে, কর্ম-জীবনে, ধর্মজীবনে কোথাও মুক্তি নেই! পেছন ফিরলেই দেখবেন জিভ্ বার করে ভেঙাচ্চে। মোক্ষলাভ না হলে বোধহয় এর হাত থেকে রক্ষে পাবার কোন উপায় নেই।

বাঙলাদেশে যেমন পাঠকের চেয়ে লেখক, গাইয়ের চেয়ে তবলিয়া, মক্কেলের চেয়ে উকীল, কর্মীর চেয়ে কর্মপণ্ডকারী, সিনেমা তারকার চেয়ে ডিরেক্টর, কেরাণীর চেয়ে অফিসার,

চোরের চেয়ে পুলিশ বেশী—তেমনি এখানে স্রষ্টার চেয়ে সমালোচকের ঠেলায় চক্ষু অন্ধকার! তাও সমালোচনা হলে তো বাঁচতুম, নিছক পেছনে লাগা। সকলের কাছ থেকে ঠোনা খেতে খেতে প্রাণ যায়!

পৃথিবীতে কেউ ভাল নয়, কোনটা ভাল নয়, কিছু ভাল নয়। সর্বদা রামচিমটে নিয়ে সবাই সবার নাক ধ'রে টানাটানি কর্চ্ছে। তার ফলে সেইটেই ক্রমাগত লম্বা হয়ে আসছে কিন্তু মা জগদম্বা আসল উন্নতির ক্ষেত্রে রম্ভা দেখিয়ে সরে পড়ছেন।

আমার সঙ্গে যারই দেখা হয়, দেখি সেই তাক খুঁজছে একটা কিছু অপরের পেলে হয়—আচ্ছা ক'রে ঠুকে দিই, এইভাব আর কি! চতুর্দিকে লোকে হাতুড়ি, খোন্তা, কাস্তে, র‍্যাঁদা নিয়ে ঘুরঘুর কর্চ্ছে। যাদের তা নেই তাদের কাগজ আছে, সেটাও যার নেই তার মুখ আছে, যদিও সে মুখের দিকে চাওয়া যায় না, কারণ সে এমনি ছির্‌কুটে আছে। কাছে গেলেই মনে হয় কামড়ে দেবে। তাহ'লে আপনারা বলতে পারেন, এই নিষ্করুণ পৃথিবীতে আমরা বেচারীরা করি কি? মানুষ সমালোচনা করুক দুঃখু নেই কিন্তু সমালোচনার নাম ক'রে যদি চোনা ছড়াতে ছড়াতে চলে, তাইলেই চক্ষু পোনামাছের মত গোল হয়ে ওঠে কিনা বলুন?

আপনারা হয়তো যুক্তি দেখিয়ে বলবেন, যে বাপু হে, সংসারটি যে এখনো পান্‌সে তরমুজের মত হয়ে যায়নি তার

কারণ—লোকের কাছ থেকে নিন্দের ভয় আছে। তা না হলে দেখতে সবাই অকুতোভয়ে যা-খুশী তাই ক'রে বেড়াতো, কারুক রক্ষে থাকতো না। এত করেও মনে কর, সব রক্ষে করা যাচ্ছে না, কত কেলেঙ্কারী হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ঐটি না থাকলে যে কি অবস্থা হ্‌ত, তা কল্পনাও করতে পারতে না।

রাস্তায় চলেছ হঠাৎ হয়তো অনুভব করলে যে, একজন তড়াক্‌ করে তোমার কাঁধের ওপর চ'ড়ে হেদো পর্যন্ত এগিয়ে গেল—বাজার যাচ্ছ পেছন থেকে এসে একজন কাছাটি খুলে দিয়ে গেল, ফুটপাতে এক-জনের পা পিছ্‌লে গেল, সে হয়তো তোমার লম্বা দাড়িটা ধরে কিংবা চলমান কোন কুমারীর লম্বমান বেনীটি পাক্‌ড়ে ব্যালেন্স ঠিক করে নিলে।

এসব করতে যে লোকে ভরসা পায় না—তার কারণ, ঐ নিন্দের ভয়—ঐ গালাগাল !

কিন্তু গাল খেয়ে যদি মানুষ শোধরাতো তাহ'লে আর তুনিয়ায় কেউ বেতাল হ'ত না। এত গালমন্দের ভেতরেই তুনিয়ার চতুর্দিকে যে সব মাল আমদানী রপ্তানি হচ্ছে তার কোনটা ভাল বলতে পারেন ? সব সমান !

আচ্ছা, চুরি নিন্দনীয়—গাল খাবার জিনিস। হাতে হাতে ধরা পড়লে, মার তো অনিবার্য কিন্তু এখন সবাই গাল দিয়ে বেড়ালেও তা কমেছে কি? বরং চতুর্দিকে যুদ্ধের পর এত লোভের ও লাভের চার ফেলা হয়েছে যে, স্বাধীনতা পাবার পর দেশের যা-কিছু আছে তাই যে-যেখানে পারছে পাচার করতে সুরু করেছে। ছিঁচকে চোরদের জন্যে পেনাল কোড আছে, কিন্তু চোরাকারবারীদের পুলিশে ধরিয়ে দিলেও আইনে তাদের ধরে রাখার ব্যাবস্থা নেই! ডিফামেশন বাঁচিয়ে খবরের কাগজে তাহ'লে গাল দিন।

লোককে ঠেঙানো পাপ—দিলে মাথায় এগারো ইঞ্চি বা আধলা ঝেড়ে, আপনি তিন হাত লাফ দিয়ে তারপর শুয়ে পড়লেন। মারের কারণ জিজ্ঞাসা করুন, হয়তো শুনবেন ব্যাপারটা কিছুই নয় তার মতের সঙ্গে আপনার প্রাণের গৎ ঠিকমত মিলছিল না। এদের গাল দিয়ে ঠিক করবেন?

ছেলের বিয়েতে মেয়ের বাপের গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় করাটা নিন্দের কিন্তু কোন বেয়াই কি গাল খেয়েও আপনার গাল খামচাতে ছাড়ছেন?

এগজামিনে টোকা অনুচিত—সেখানে একেবারে টেলীগ্রাফের টরে টক্কা করতে করতে ছেলেরা ঢুকে যাচ্ছে, পাশ করলেই বাবা একটা টুকটুকে বৌ এনে দেবে তো? লোকে নিন্দে করলে তো ভারী বয়েই গেল! বরং অবিরত নিন্দে

কুড়িয়ে কুড়িয়ে অধিকাংশ ব্যক্তিই অনিন্দ্যনীয় পুরুষ হয়ে বসে আছে, এই তো দেখতে পাচ্ছি।

অবিরত গাল খেয়ে খেয়ে লোকের গায়ের ছাল যে কি রকম শক্ত হয়ে ওঠে সেটা কেউ বোঝেন না। ছেলেবেলা থেকে মরবার টাইম পর্যন্ত এই দেশের সর্ববিভাগে জীবন-যাত্রার প্রথম পাথেয় গাল খাওয়া—গাল ধরে আদর করার লোক এক উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা ছাড়া আর তো বাস্তবে পেলুম না। তার ফলে হয়েছে কি শতকরা নব্বই জনের মেজাজে সোডা ওয়াটারের চেয়ে বেশী ঝাঁঝ, কথা কইলেই ফোঁস ক'রে ওঠে। যে সুবিধে পাচ্ছে সেই অপরকে তেড়ে মারতে যাচ্ছে। কেন একটু ভাল ক'রে কথা কইলে ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়? আসল গলদ না দেখিয়ে শুধু কি গাল দিলে কেউই তাল ঠিক রাখতে পারে না সেটা বোঝেন না?

ছেলেবেলা থেকে কি সুরু হয়েছে দেখুন। সকলেরই ইচ্ছে আমাকে আদর্শ চরিত্রে দাঁড় করাবেন—তার ফলে সবাই মিলে আদা-জল খেয়ে গাল সুরু করলেন। হনুমান, গর্দভ, জাম্বুবান ও অন্যান্য যাবতীয় বিদ্‌ঘুটে প্রাণীর তুলনায় আমি যে সমান তা প্রত্যেক পদক্ষেপে প্রমাণিত করবার জন্য বাড়ির অভিভাবকদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। সে পর্যায় থেকে বোধহয় আজও উঠতে পারিনি ব'লে আমার বন্ধুবান্ধবদের ধারণা।

বিদ্যালয়ে শিক্ষকমশাইদের কাছে গেলুম।—বিদ্যালাভ করাতে তাঁরা একপায়ে ডবল বেঞ্চির ওপর কাণ ধরিয়ে আমায় দাঁড় করিয়ে রায় দিয়ে দিলেন আমি একটি বৃহৎ অনড্বান্! বাড়িতে গিয়ে আবার অভিধান খুলে তার মানে দেখি, ষাঁড়, পড়াশুনো না করিয়ে আমাকে নাকি দিশী ট্র্যাক্টরের সঙ্গে জুড়ে দিলে ফসল ফলতো ভাল।

আপিসে বেরোলুম—বড়বাবু বলে দিলেন তুমি তো একটি আস্ত আহাম্মক হে, কি করে পাস করেছিলে? ইংরিজিতে একখানা গুছিয়ে চিঠি লিখতে পার না?

আমি নিতান্ত বিনীতভাবে বললুম, আজ্ঞে ওটা এদেশে বোধহয় কেউই লিখতে পারে না। কারণ আপনি যা লেখেন তা ছোটসাহেব কেটে দেন, আবার ছোটসাহেব যা পাঠান বড় সাহেব তার চেহারা পাল্টে দেন, শেষপর্যন্ত আর কারুরটাই ঠিক থাকে না বলে আমি আর ঐ নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

চাকরি যেতে যেতে যাহ'ক করে রয়ে গেল। পরে শুনলুম টিফিনের সময় আমি খেতে গেলে সারা ডিপার্টমেন্টে বড়বাবু আমার আহাম্মুকীর বার্তা প্রচার করতে করতে গাল দিতেন, আর যাদের চাকরিতে উন্নতির ইচ্ছে, তারা আবার সব-কিছু বুঝতে না পারলেও হো-হো ক'রে হেসে, বড়বাবুর তালে তাল দিয়ে একেবারে নিজেদের টিফিন খাওয়ার কথাটাও ভুলতে সুরু করতেন।

যাক্ মশাই, এরপর সামাজিক ক্ষেত্রে আসুন। বিয়ে হ'ল। লোক-পরম্পরায় শুনলুম আমার ব্যাখ্যানায় শ্বশুরবাড়ির নেমন্তন্নখানেওয়ালারা বাড়ি গিয়ে নাকি প্রচার করেছেন, যে এর চেয়ে ওরা মেয়েটার গলায় পাথর বেঁধে ডায়মণ্ডহারবারের গঙ্গায় ছেড়ে দিয়ে এল না কেন? ঐ মোষের মত রং, জালার মত পেট, বোয়ালমাছের মত চোক, সিংহি মাছের মত নাক ইত্যাদির সঙ্গে কেউ মেয়ের বিয়ে দেয়?

আবার এপক্ষে যারা খ্যাঁট্ মেরে বৌ-ভাত রক্ষে ক'রে গেলেন তাঁরা আড়ালে কনের ব্যাখ্যা করে বললেন, যে কোথা থেকে এক শাঁকচুন্নীকে ধরে নিয়ে এল বলতো? উপরন্তু বৌ-ভাত করার দরকার কি ছিল? আমি যা খাইয়েছি তা নাকি সব খারাপ। কারুর পেট ছেড়ে দিয়েছে, কারুর সারাদিন চোঁয়া ঢেঁকুর উঠেছে আবার কারুর খেয়ে নড়বার শক্তি পর্যন্ত নেই।

পরে বছর তিনচারের মধ্যে ছেলেপুলে গুটি তিনেক হতেই আমার বন্ধু-বান্ধবরা আমার আক্কেলের অভাব দেখলেন। সবাই প্রায় একবাক্যেই যাচ্ছেতাই করে বলতে সুরু করলেন, ও একটা গাধা না কী? দেখ্ছে আমরা প্রত্যেকে সাত আটটা ক'রে নেণ্ডি-গেণ্ডি নিয়ে নাজেহাল হচ্ছি, এ দেখেও হতভাগাটার একটু শিক্ষা হল না? ছিঃ ছিঃ!

এসব গেল পারিবারিক জীবনের কথা। এইবার বাইরের ব্যাপার শুনুন। কাগজে একটি লেখা বার করলুম,

সমালোচকরা যেন মুখিয়ে ছিলেন। তিন তিনখানা কাগজে আমার খারাপ লেখার বদলে ভাল ভাল সব প্রবন্ধ বেরিয়ে গেল—উঃ, তার কী ওজস্বিনী ভাষা! সমালোচকরা লিখলেন—উহার কলম কাড়িয়া লও, লেখা ইয়ার্কি নহে, বাঁদরামি করিতে হয় আলিপুরের চিড়িয়াখানা আছে, ঢুকিয়া পড়, সেখানে বহু সুযোগ পাইবে—মানে, ওঁরা যেন সেখানকার সুলুক-সন্ধান আগে থেকে দেখে এসে এখন ছাড়ান পেয়ে বলছেন, এই ভাবটা আর কি! মশাই, লেখা ছেড়ে দিলুম ঐ দুঃখে!

গেলুম পলিটিক্সে—সেখানে একটা কানই লোকে কামড়ে উড়িয়ে দিলে—টি ঁকতে পারলুম না। যাঁদের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলুম তাঁরা বললেন, যে ধৈর্য ধ'রে থাকো, বাকী যে-কানটা আছে ওটাও খোয়াও তারপর শাইন্ (shine) করবে—কারণ ও-দুটোর কোনটাই যখন কেউ পাকড়াতে পারবে না—তখনই তুমি নেতা হবার যোগ্যতা অর্জন করবে, লোকে যাচ্ছেতাই করে গালমন্দ দিলেও শুনতে পাবে না। অতটা পারলুম না তাই পালিয়ে গিয়ে ঢুকলুম স্টেজে, ওর চেয়ে একটু ছোটখাট জায়গায়।

সেখানে তো প্রথম থেকেই গাল খাওয়া সুরু হ'ল। বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রীরা তো আমাকে মানুষ বলেই গণ্য করলেন না। একটা ভাল পার্ট কপালে জুটলো না, মাইনেও না। উপরন্তু শুনলুম সমস্ত নাটকটা নাকি আইস্ক্রীমের মত

সবার অভিনয়ে জমে উঠলেও শুধু একটা দূতের জন্য ঝুলে পড়েছে। বলা বাহুল্য সে দূত—আমি। একা একটা মাঠে, দূত দৌত্য করতে গিয়ে শত্রুপক্ষের হাতে বন্দী হয়ে গেল। কথার মধ্যে তার ছিল, এ্যাঁ—এইটুকু বলা, কিন্তু তাতেই থিয়েটারের ভেতর মহলে চ্যাঁ-ভ্যাঁ সুরু হয়ে গেল। লাঞ্ছনার যেটুকু বাকী ছিল তা আবার নাট্য-সমালোচকরা ঠিক ক'রে দিলেন।

দূতের ওপরই দু-কলম বেরিয়ে গেল। দূত অবধ্য এটা কর্তৃপক্ষই যখন মানলেন না তখন তাঁরাই বা ছাড়বেন কেন? লিখলেন—এই ভূতটিকে পরিচালক মহাশয় কোথা হইতে যোগাড় করিয়াছিলেন? ছ্যাৎ ছ্যাৎ করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেও আমাদের গায়ের ঝাল মিটাইতে পারা যায় না—উহার আবির্ভাবের সঙ্গে স্টেজ হইতে গুঁতাইয়া বাহির করিয়া না দিতে পারিয়া আমাদের মন সারাক্ষণ খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল। তারপর সে আরও কত কথা! পার্ট করতে না-এসে হাটে

আমার বেগুন বেচা উচিত ছিল, কিম্বা গরুর জাব্‌না দিলে উপকার হ'ত ইত্যাদি ইত্যাদি।

এঁদের গুঁতোনোর হাত থেকে বাঁচতে শেষে সম্পাদক মশাইকে চিঠি লিখে অনুরোধ জানাই—দোহাই মশাই, হয় আমার পার্টের দোষটা দেখিয়ে দিতে বলুন, নয় ওঁদের শিং ধরে গোয়ালে পুরুন—নইলে আমি গরীব বেচারী গেলাম! এঁদের গুঁতো আর সহ্য হচ্ছে না!

কিন্তু সহ্য না করেই বা উপায় কি? কার গুঁতুনি থেকে বাঁচবো? সংসারের চতুষ্পার্শ্বে এঁরা ছাড়াও এত চতুষ্পদ বিচরণ করছে, যে সবার গুঁতুনি খেতে খেতেই মাটিতে উবুড় হয়ে প'ড়ে থুঁতনিটাই প্লেন হয়ে এল—আমি সামলাবো ক'দিক?

হোলির হুল্লোড়

আমি বোধহয় খুব শিগ্‌গিরই ধর্মান্তর গ্রহণ কর্‌ছি—কারণ, চতুর্দিকের ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমার মনে হচ্ছে, যে আর হিন্দু হয়ে থাকা আমার চললো না। পাল, পার্বণ, পূজোর ধূম ত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে অসম্ভব বেড়ে গিয়েছেই—উপরন্তু চাঁদা, হুজুগ ও হুল্লোড় যেভাবে ওগুলির সঙ্গে তাক্ ডুমাডুম্ করতে করতে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে, তাতে পিত্তি পর্যন্ত খাক্ হয়ে গেল। সবাই মিলে যাকে বলে একেবারে পাগল ক'রে আমায় ছেড়ে দিলে।

নির্বিঘ্নে, ভদ্রসম্মতভাবে, লোককে না জ্বালিয়ে কোন উৎসব এদেশে বোধহয় হবে না। হয়তো আপনারা বলবেন, উৎসব হলেই হৈ-চৈ একটু হয়ে থাকে, মানুষের প্রাণের চাপা আনন্দ বাইরে তোড়ে বেরিয়া আসে—সে সময় অত হিসেব ক'রে কেউ চলে না, চলতে পারে না। তোমার আবার সবেতে ফুট্ কাটা স্বভাব।

আজ্ঞে ভুল করছেন, উৎসবের নাম ক'রে যখন লোকে কাঁধে চোড়ে চূড়ান্ত বাঁদরামি করে দেখি, তখনই আর থাকতে পারি না। ফুট্ কি সাধে কাটি, সকলে মিলে তপ্ত কটাহে বসিয়ে এদিকে যে আমায় ফুট্‌কড়াই করে ছেড়ে দিলে, সেটা

ত আপনারা দেখতে পান না—শুধু আমারই দোষ দেখেন। এ সম্বন্ধে আপনাদের অভিজ্ঞতা হবে কোথা থেকে বলুন? আমার মত যদি হেঁটে প্রত্যহ দু'বেলা বাজার-দোকান করতে হ'ত, আপিসে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে ট্রামে-বাসে যেতে হ'ত এবং একশো টাকা নিয়ে একত্রিশটি হাঁয়ের ভেতর কিছু মাল ঠেসে দিতে হ'ত তাহ'লে বুঝতেন, যে গা ঘামে কি না!

বাবুরা সেদিন দোল খেলতে বেরিয়েছিলেন। কাগজে দেখেছেন বোধহয়, পাঁচশো পঁচাত্তর জন সেদিন দোলের স্ফূর্তি মারতে গিয়ে পুলিস হাজতে গেছেন—এর মধ্যে আমার গুষ্টির ক'জন আছেন, খবর রাখেন কি? অন্তত পঁচাত্তর জন। আদালতে পাঁচটি দশটি করে নগদ ম্যানি (Money) খেসারৎ দিয়ে নীলমণির দল একে একে বাড়ি ফিরে এসেছেন, কিন্তু ভুঁটে, গোঁদল, ন্যাংচা, ধুম্‌সো, কেঁদো আর হুড়কোটাকে এখনও জামীনে খালাস ক'রে আনতে পারি নি।

বাড়িতে আবার তার জন্যে কান্নাকাটি কত! আমি বলি, যখন এরা বাইরে মাথা ফাটাফাটি ক'রে বেড়ালো, তখন বারণ করতে কারুর খেয়াল হয় নি? আর এখন বিপত্তারণ মধুসূদনকে স্মরণ করতে করতে ছুটে মর তুমি। তার ফলে পাহারাওয়ালা থেকে শুরু করে উকীল, ব্যারিস্টার, এটর্নীর পদধারণ ক'রে আমায় ছুটে বেড়াতে হচ্ছে, প্রত্যেকের কাছে

নাকখৎ দিয়ে বলতে হচ্ছে, যাক্‌গে মশাই, ছেলেমানুষ খেয়ালের চোটে কতকগুলো বেমক্কা কাজ করে ফেলেছে, ওদের এবারটা রেহাই দিন। তাই শুনে তাঁরা আবার আমায়—এই মারেন ত এই মারেন!

ছেলেমানুষ? বলে, সময়ে বিয়ে দিলে সব হাতীর মত তুম্বো তুম্বো ছেলে হয়ে যেত, ছেলেমানুষ?—ইত্যাদি ইত্যাদি মুখ ভেংচে সে কী গালাগাল!

মানে, বুঝলুম দঁকে পড়লে কারুর মুক্তি নেই। সবাই নিজ নিজ মূর্তি ধারণ করবেনই। আমি কী প্রতিকার করবো বলুন?

তোরা করবি নিত্যি উৎপাত, আর বার বার আমি কাঁহাতক খেটেখুটে এসে থানা-আদালত আর উকীল-বাড়ি ক'রে বেড়াই বলুন ত? সংসারে এমনি প্রতিদিন চাল-ডাল, কাপড়চোপড় কেনবার ভাবনায় মাথার ঘিলু চল্‌কে চল্‌কে প'ড়ে ভাঁড় খালি হয়ে বুদ্ধি ঘুলিয়ে যাচ্ছে, তার ওপর এইসব ছোঁড়া-ন্যাটার উপদ্রব নিত্যি সওয়া যায়?

বাবুরা রোজ একটা না একটা হাম্‌লা ক'রে আসবেন, আর তার তাল সামলাবার ভার পড়বে আমার ওপর। তাও এক-আধবার হয়, নয় তার মানে বোঝা যায়, কিন্তু যে-কোন পাল-পার্বণ আসুক, অমনি দেখবেন একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে বসে আছে। এটা যেন এদেশের ছেলেপুলেদের একটা স্বাভাবিক চারিত্র-ধর্মে দাঁড়িয়ে গেল। এতটুকু নিয়ম, এতটুকু রসবোধ,

ওজন, বুদ্ধি কোন কিছুর বালাই নেই। অপর জায়গায় যাও-বা আছে, আমার বাড়িতে ত-একদম নেই।

গম্ভীরভাবে বাড়ির সবাই বললেন, দোলে রং খেলতে হয়, ফাগ মাখতে হয়—তাতে নাকি শরীর ভাল থাকে। শরীরের জন্যে যোগ-ব্যায়াম আছে, ডাম্বেল আছে, ডন-বৈঠক আছে, সংযম পালন করার কথা আছে, সে সব চুলোর দোরে যাক্—একদিন ফাগ মেখে এঁরা একেবারে কান্তি বদলে ফেলবেন। আচ্ছা, এসব কথা শুনলেও রাগ হয় কিনা বলুন? যাই হ'ক ফাগ কোথাও মেলে নি, বাবুরা রং খেলতে বেরুলেন, যেখানে-সেখানে যার-তার মুখে এমন রং মাখালেন, যার ফলে তাঁদের অভিভাবকদের আজও মুখে আলকাতরা মেখে হনুমান সেজে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে বলবার জো নেই—ধর্মে হস্তক্ষেপ হয়ে যাবে হয়তো। অতএব সব নীরবে সহ্য কর! এতে যদি আমি ধর্মান্তর গ্রহণ করার কথা ভাবি, তাহ'লে আমার কোন অপরাধ হয়কি? ধর্মের নাম নিয়ে, মোচ্ছবের নাম নিয়ে চরম ইয়ার্কি ক'রে বেড়াবে তোমরা, আর আমরা জুলজুল করে চেয়ে চেয়ে তাই দেখবো—এ অসহ্য!

মশাই, পঞ্চাশবার—বুঝেছেন, দোলের আগে থেকে জানি পরে সবাইকে ঘোল খাওয়াবে ভেবে ছোঁড়াগুলোকে খবরের কাগজের কাটিং কেটে কেটে বুঝিয়েছি যে, দেখ্, দিনকাল খারাপ, যার-তার গায়ে রং ছিটুস্ নি—এ আর ১৫ই আগস্ট

নয় যে, লাটসাহেবের বাড়ি থেকে থালা, ডিস্ পর্যন্ত গ্যাঁড়া মেরে বাড়িতে ঢোকাবি, আর কেউ কিছু বলবে না—এখন অন্য ব্যাপার, দোহাই তোদের, কোন ফ্যাসাদ বাধাসনি। তখন সব কটা মিচ্‌কের মত চুপ ক'রে রইলো।

তারপর দিনই 'হোলী হ্যায়!' বলে যত কিছু আন্‌হোলি ব্যাপার আছে, তাই সংঘটনের জন্য সকাল থেকে আদা-জল খেয়ে সব দিকে দিকে বেরিয়ে পড়লেন। পাড়ায় সুবিধে হবে না, সেখানে পট্‌কা আর পুঁচ্‌কেগুলোকে রেখে তাঁরা বে-পাড়ায় বেরুলেন হুজ্জুৎ করতে। তার ফলে ফচ্‌কেগুলো পিছ্‌লে বেরিয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু ওঁরা পুলিসের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন। তবে ছ্যান্‌কাগুলোও কম গেল না।

প্রাতঃকাল থেকেই হাঙ্গামা শুরু হল। পট্‌কাকে দু'আনা পয়সার ফাগ কিনতে দিয়েছিলুম, কিন্তু তিনি তৎপরিবর্তে বাঁদুরে রং গুলে গঙ্গাস্নান গমনোদ্যত এক বৃদ্ধাকে এমন রং মাখালেন, যার ফলে আমি ও আমার চোদ্দপুরুষ সকলে অনিবার্য নরকবাসের ব্যবস্থা-পত্র পেয়ে গেলুম। উঃ! স্ত্রীলোক যে কী গাল দিতে পারেন, সেইদিন মর্মে মর্মে অনুধাবন করেছিলুম।

বেলা বাড়তে সে যে কী কাণ্ড শুরু করলে, তা কি বলবো! ট্যাক্সি করে লোক যাচ্ছে, দে ট্যাক্সিতে আব্‌লুশ রং ছিটিয়ে, ট্রামে-বাসে লোকে নিতান্ত দায়ে পড়ে সেদিন

কেউ বেরিয়েছে, তার ঘাড়ে দে খানিকটা গোবর আর আলকাতরা গুলে। পৃথিবীতে ভদ্দরলোক রং যতগুলো আছে নয় তাই দে, যা ধুলে উঠে যায়—তা নয়, যত বিদ্‌কুটে কিম্ভূত, নোংরা, দুর্গন্ধ, রং-বেরং বাজারে বেরিয়েছে বা বেরোয় নি—তাই আবিষ্কার ক'রে ক'রে কলম্বাসের ছানারা লোককে ছিটুতে লাগলো।

ওদের খুঁজতে গিয়ে আমি পর্যন্ত মনে করুন, যখন বাড়িতে দুটোর সময় ফিরলুম, তখন মনে হলো আফ্রিকার কোন জঙ্গল থেকে কোনরকমে বেরিয়ে শহরে ঢুকে পড়েছি।

আমায় সেই অবস্থায় দেখে সবাই কোথায় একটু সহানুভূতি দেখাবে তা নয়, উপরন্তু গিন্নী পর্যন্ত গালে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, ওমা! এই সেদিন কণ্ট্রোল থেকে ঐ কাপড়টা কেনা হল, আর তুমি বুড়ো-মদ্দ তাই প'রে রং খেলে এলে?

শুনলেন কথাটা? আমি বুড়ো দামড়া, আমার আর কাজ-কর্ম নেই, আমি রং খেলতে বেরুলুম? এসব ঢংয়ের

কথা শুনলে রেগে টং হয়ে যেতে হয় কিনা আপনারাই বলুন ত ?

আমিও তাঁই খিঁচিয়ে জবাব দিলুম, তাইতো ! আমিই ত ইচ্ছে ক'রে সং সাজলুম কিনা—ওদিকে যে তোমাদের গুণধর কিং-কংরা বাঙলাদেশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তার খেয়াল রাখ ?

কথাটা আর শেষ কর্তে হল না, ইতিমধ্যেই বাবুদের সব মাতামতির খবর কাণে পৌঁছল। তখন ছোটো—তাদের খালাস করতে।

এ-বাজারে একটা ছেলে খালাস করা সোজা কথা ? বিশেষ পুলিসের হেফাজৎ থেকে ? টানাটানিতে প্রাণ যায় আর কি ! তারপর প্রত্যেক ছোঁড়াটার নামে যা সব অভিযোগ, তা শুনলে ত একটি একটি রসগোল্লা জলযোগ ক'রে বিছানায় কাৎ হয়ে শুয়ে পড়া ছাড়া ভেবে কিছু কুল-কিনারা করতে পারা যায় না।

গুণের কথা বলবো কি, ন্যাংচা, ধুম্‌সো, আর হুড়্‌কোটা কোথা থেকে বোধহয় সিদ্ধি-মিদ্ধি গিলে একটা হরিনামের খোল-খত্তাল জোগাড় ক'রে তাই বাজাতে বাজাতে ভূত সেজে কোন্ হাসপাতালে এক অপারেশনের ঘরে ঢুকে নেত্য শুরু ক'রে দিলে। আচ্ছা, কী কাণ্ডটা বুঝুন !

ভুঁটে আর কেঁদো আবার অতি-আধুনিক ত ? তাঁরা

আবার গোটাকতক বান্ধবী জোগাড় ক'রে, জীপ নিয়ে কলকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত রং খেলবার জন্যে ট্রিপ্ দিতে বেরিয়েছিলেন, তারপর বে-জায়গায় আর একদলের সঙ্গে হিচ্ হতে তারা আচ্ছা করে ঠেঙ্গিয়ে সব ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যায়—পরে দলবল সমেত ধরা প'ড়ে তাঁরা থানায় যান।

ধন্যি এদের সখীরাও বাবা! থিয়েটারে, বায়োস্কোপে, হোটেলে নেচেও এদের আর সুখ হচ্ছে না। 'উন্মাদিনী কে রে ফেরে' ক'রে সব রাস্তায় মাতন করতে হুম্ হুম্ বেরিয়ে পড়লো।

বলবার জো নেই—সব সমান! নারী-পুরুষের সমান অধিকার। কিন্তু বাপু, এটা বোঝো না, যে স্বয়ং বিধাতা-পুরুষের সে ইচ্ছে থাকলে তো গড়বার সময়ই দু'পক্ষকেই এক প্যাটার্ন ক'রে ছেড়ে দিতেন। তা এসব বললে, শুনছে

কে? বেশী বললেও বিপদ! কোনদিন রাস্তায় ধরে বে-ইজ্জত করবে! নিজেরা না করুক, কতকগুলো ষাঁড়কে লেলিয়ে দিয়েও হয়তো গুঁতুবে, তাই চুপচাপ থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য। কিন্তু ক্রমশ সব দেখে-শুনে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাচ্ছে, আর ভাবছি, যে মরবার বয়েস হয়ে এল—চিতায় ওঠবার সময় বরাবর এখনও না জানি আরও কি-কি অভিজ্ঞতা নিয়ে শেষ পর্যন্ত ভবনদীর কূলে গিয়ে ঘাই মারতে হবে।

মা সরস্বতী ও ছেলেদের মতিগতি

বুড়ো হলে মানুষের অভিজ্ঞতা বাড়ে এই এতদিনের ধারণা ছিল, কিন্তু বর্তমান জগৎ যেভাবে চলেছে, তাতে ক্রমশঃ আমাদের হামাগুড়ি দেবার অবস্থা হয়ে এল দেখতে পাচ্ছি। চতুর্দিকের ধাক্কা ও ধোঁকার ফলে বুড়োখোকা বনে ব'সে থাকা ছাড়া আর ত কোন উপায় দেখি না।

সংসারটা কোন্ দিকে চলেছে, তার দিঙ্‌নির্ণয় করতে গিয়ে দিগ্বিদিক হারা হয়ে এতখানি অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে ফেলছি যে, অভিজ্ঞতা জিনিসটার আর কারুর কাছে দাম থাকছে না। কে যে কী, তা বোঝা এত শক্ত, যে চুপ ক'রে সোজা বোকার মত চেয়ে থাকা ছাড়া আর আমাদের করণীয় কিছু নেই।

এই জন্যে পারতপক্ষে আমি একালের লোকেদের বিষয় নিয়ে মশাই, মাথা ঘামাতে চাই না, কিন্তু না ঘামিয়েই বা করি কি বলুন? পারিপার্শ্বিক ঘটনায় যে মাথায় বাড়ি মেরে মনটাকে সেই দিকে সজাগ করে তোলে।

এই ধরুন না, হালে যে মা সরস্বতীর পূজো গেল, তাতে আমায় কি কেউ রেহাই দিলে? এক একটি মোচ্ছব আসবে আর চতুর্দিক থেকে আমার কচ্ছটি ধরে (পুচ্ছটি ভগবান বহুদিন পূর্বেই খসিয়ে ফেলেছেন তাই রক্ষে) টান লাগালে, কোন দিক সামলে সুমলে চলা যায়?

একান্নবর্তী পরিবারে আমার বাস, অতএব সর্বসাকুল্যে একষট্টিজন ছেলেমেয়ে বাড়ীতে, একেবারে যাকে বলে চাঁদ সূর্যির হাট বসিয়ে রেখেছেন। পড়াশুনো মা বিদ্যেধরীর গর্ভে সঁপে দিয়েছেন বহুকাল, কিন্তু বিদ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আহ্বানে ত্রুটি নেই। নিজেরা একটা কিছু উপায় করে কর্, তা বয়ে যাচ্ছে সব তুমি কর, তুমি টাকা দাও! আমরা শুধু তোমার পয়সায় হৈ হৈ করি আর ইয়াকি মারি! মানে এরা আমায় অতিষ্ঠ করে মারলে! কিছু বলুন দেখি, আপনাকেই ধোলাই দিয়ে ছেড়ে দেবে। আমাকে তো ধোপার পাটের মত নিত্য আছাড় দিচ্ছে!

সেজ-কর্তার ছেলে, ভুঁটেটা একটা একের নম্বরের শয়তান! যেখানে গোলমাল, দেখবেন ভুঁটে সেখানে সর্বাগ্রে হাজির।

কতদিন বলেছি, ভুঁটে, ওসব করিস নি, আগে ম্যাট্রিকটা দিয়ে তারপর যা-খুশি কর্!—বয়ে যাচ্ছে! সে আমার পেছনেই পাড়ার ছেলেগুলোকে লেলিয়ে দিলে। সকাল থেকে একত্রিশটি সরস্বতী পূজোর চাঁদার খাতা এসে হাজির।

নীচের থেকে কড়া নাড়তেই যেমনি জিজ্ঞেস করি, কে? অমনি শুনি সুধাকণ্ঠের চীৎকার, সরস্বতী পূজোর চাঁদাটা দেবেন?

তাও কি দু'-চার আনা দিলে হবে? মোটেই না। আপনি ভুঁটেদার জেটু—অতএব নিদেন এক টাকা দিতেই হবে! দর-কষাকষি করেও আট আনার কম নিলে না। এই ক'রে পনেরো ষোল টাকা খামকা বেরিয়ে গেল।

এরপর ইস্কুল আছে, আপিস আছে, মুদিখানার দোকান আছে, সেগুলো তো বাঁধা! আমাদের পাড়ায় আবার চুল-ছাঁটায়ের দোকানে পর্যন্ত পূজো। হাজার হোক আর্টের ব্যাপার তো, সেই বা ছাড়বে কেন? অতএব বীণা-বাদিনীর ঝঙ্কারে আমাদের মত গেরস্তর কণ্ঠে কাংস-ক্রেঙ্কারের ধ্বনি ওঠবার অবস্থা হল! দলে দলে মা আসতে শুরু করলেন।

মনে করুন, কুমোররা রং-বেরংয়ের ঠাকুর গড়েও আর হালে পানি পেলে না, ক্রেতার বহর দেখে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলো, যে সারা বছর ধরে আরও ঠাকুর না-গড়ে কি ভুলই করেছে।

স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের বাক্‌শক্তি যেমন অসম্ভব বেড়েছে তেমনি বাগ্দেবীর পূজোও সর্বত্র শুরু হয়েছে। কিচ্ছু বলবার জো নেই—নির্বাক হয়ে থাকা ভাল, নচেৎ এ দেশ থেকে চলে যাও! তাই চুপ মেরে জড়-ভরতের মত বসে আছি আর পৃথিবীশুদ্ধ লোক কানের কাছে বকছেন। বকা

এবং বখামি এত বেড়েছে, যে বীণাবাদিনীর পূজো ছেড়ে গদাঘাতিনীর পূজোর প্রচলন না হলে আর কাউকে শায়েস্তা করা যাবে না। সে পূজো শুরু হলে আমি ত সর্বাগ্রে আনা বারো চাঁদা দিয়ে আসবো।

তারপর নেমন্তন্নর চিঠি পেয়েছিলেন? তার কী ভাব, কী কবিত্ব! আসবেন সকালে নিতে অঞ্জলি, সন্ধ্যেয় আসবেন দেবীর অঙ্গনে রিণিঝিনি ঝঙ্কারের তান শুনতে। একেবারে জান ঠাণ্ডা করে দিলে। এর ওপর আনবেনটা—সেটা অবশ্য উহ্য—কিছু দক্ষিণে!

মশাই দক্ষিণে দিয়েও কি রেহাই আছে? কোথা থেকে সব ভাড়া করা লজ্ঝোড় এমপ্লিফায়ার নিয়ে এল, তিনদিন ধরে এক মিনিট কামাই নেই। বাজিয়েদের বিরাম নেই, বিরক্তি নেই, ক্লান্তি নেই—অবিরত ঘড়্ঘড়্ চলছেই। তার আবার যেমনি আওয়াজ তেমনি সুর—একেবারে যমের দক্ষিণদ্বার দেখিয়ে দেবার ব্যবস্থা।

মনে করুন বাড়ীতে একটা রেডিও থাকলেই কি অবস্থা—

তার একটু খুঁৎ বেরুলে লোকে ছ্যাৎ ছ্যাৎ ক'রে গাল দিতে থাকে, আর সেই জায়গায় একুশটা এমপ্লিফায়ারে যদি একত্রিশটা সুর সজোরে হরদম কানের কাছে বাজতে থাকে, তাহলে মানুষ বাঁচে কি ক'রে বলতে পারেন? মানে, একজন গায়কের গান চাপালে মনে হয় অন্তত জনা-দশেক কোরাস সুরু করেছে, একটি যন্ত্রীর যন্ত্র বাজলে মনে হচ্ছে কনসার্ট শুরু হল, ভারতীয় সিমফনির রূপ যে কেমন হতে পারে তার একটা পরিচয় ওর থেকেই পাওয়া যেতে লাগলো। অটোমেটিক কম্পোজিশন একেই বলে। এই গান আবার ফিরে ফির্তি প্রত্যেক দশ মিনিট অন্তর শুনছেন, কারণ রেকর্ড ত সবে পাঁচখানি—অতএব তাই শোন!

কিন্তু এদিকে আসল দেবীর পূজোর জোগাড় কিছু নেই, অঞ্জলি দিতে এসেছে একপাল পুঁচকের দল, বড়রা প্রাতঃকাল থেকে চায়ের ভাঁটিতে ঢুকেছেন। খরচের খাতা দেখুন—৮০৲ এমপ্লিফায়ার ভাড়া, প্রতিমা ১০৫৲, চাঁদোয়া ও চেয়ার ৫৫৲, রান্না ও চা খরচ ৩৫৲, বাজী বা বোমা তৈরীর খরচ ২৭৲, প্রতিমা নিরঞ্জনের লরী ৪৪৲, ভোগ-রাগাদি ও পুরুত মশায়ের দক্ষিণা বাবদ ৭৷৵৫, কী-অভিনব ব্যবস্থা! তাও সে ভোগ যোগবলে উড়ে যায়, আর যদি বা কিছু পাওয়া যায়, তার মধ্যে থাকে ভিটামিনযুক্ত দুটি ছোলা বা মাসকড়াই, এক কুচি শশা আর এক পয়সা সাইজের কাঁটালি কলার চাকতি—তাও কর্মকর্তাদের সঙ্গে যদি ভালবাসা থাকে তবে পাওয়া যায়।

ভুঁটে একটা মাতব্বর, অতএব তার ভাগে বেশ মোটা কিছু চাই। সে নৈবিদ্যি সাজাবার আগেই তিন কুড়ি নারকেল কুল নিয়ে বাড়ী ঢুকলো—ওর মধ্যে বোধহয় কাউকে ভাগ দেবার কথা ছিল, দেয় নি ; তাই নিয়ে বাড়ীর দরজার সামনে কী হাঙ্গামা ! ছোঁড়ারা আমাকে পর্যন্ত গাল দিতে শুরু করলে—দরজার সামনে দিয়েও সুখ হল না, একটা মাইক্রোফোন যোগাড় ক'রে কুলের কলঙ্ক প্রচার আরম্ভ হল। মাসখানেক পাড়ায় মুখ দেখাতে পারি না হতভাগাটার জন্যে।

এক ভুঁটেই আমাকে ঘুঁটে বানালে ভাবছেন বুঝি ? না—ইনি ছাড়াও মনে করুন, আরও একুশটি মাল বাড়িতে মজুত আছে !

মেজ-বাবুর ন' ছেলে, ভট্‌ভটেটা ভ্যারাইটি করতে বাক্স থেকে পঁচিশটি টাকা গাপ্‌ করলেন ! তিনি মোড়ের মাথায় এক পূজোর ভ্যারাইটি ডিরেক্টর। পাড়ার গাইয়ে বাজিয়ে নিয়ে মন উঠলো না, বে-পাড়ার সেই চিরপুরাতন কয়েকটিকে আনতে হবে—অতএব পয়সা চাই, তা না হলে তারাই বা আসবে কেন ? কিন্তু পয়সা কৈ ?—অতএব আমার তবিল ভাঙো !

টের পেলুম ভাসানের দিনে। বকবো কি ? সন্ধ্যেবেলায় তিনি কোথায় বোমা ছুঁড়তে গিয়ে বুড়ো আঙ্গুলটি খুইয়ে বাড়ীতে এসে শয্যা নিলেন। আচ্ছা, এ সব ছেলে নিয়ে কি করবো বলতে পারেন ?

চিরকাল আমরা কালীপূজোর সময়ই ফুলঝুরি আর লাল দেশলাই ছাড়া অন্য কোন বাজীতে হাত দিইনি, আর আজকাল সব-পূজোয় এই ব্যবস্থা হয়ে গেল? বোমা, দো-দমা না ছাড়লে ভাসান হবে না! আমাদের এ মুশকিলের আসন কবে হবে তা ত জানি না!

তারপর দেবীর প্রতি কী ভক্তি! প্রথমত চিরকাল প্রথামত ঠাকুর-ভাসান পূজোর পর-দিনই হয়। ন'-কর্তার মেজ ছেলে নাকুদের আবার ঠাকুর গেলেন পাঁচদিন কাটিয়ে। তা না হলে নতুনত্ব হল কৈ? তাও ভদ্রলোকের মত যা—তা নয়, দলবল নিয়ে কী স্ফূর্তি! কখনও পতিত-পাবন সীতারাম, কখনও জয় হিন্দ্, কখনও ইনক্লাব জিন্দাবাদ, কখনও বল হরি হরিবোল, সে বুলি কত! মানে, বাঁদরামির চূড়ান্ত যাকে বলে। আবার দেবীকে লরীতে তুলে কী শ্রদ্ধা প্রকাশ! দেখো মাসী, পাশটিতে বসছি কিছু মনে করো না যেন!— আচ্ছা, এ সব কি?

অনেক অভিজ্ঞতা জীবনে হয়েছে বাবা, কিন্তু ঠাকুর-দেবতা নিয়ে এরকম চ্যাংড়ামো আমি ত আগে কখনও দেখিনি। যদি বলেন, তুমি বল না কেন? আচ্ছা, কি বলবো? বললে পার আছে? আমাকেই বল হরি হরিবোল ক'রে জীয়ন্তে ভাসান দিয়ে আসবে। ন'-বাবুকে তবু বললুম, ছেলেটা যে একেবারে গেল, তিনি তার উত্তরে উল্টে রাগ ক'রে বললেন, তোমার যেমন কথা, ছেলেপুলেরা একটু পূজোয় আমোদ করবে না?

শুনুন! মা সরস্বতীকে নিয়ে যদি এই রকম আমোদ শুরু হয়, তাহলে দু'দিন পরে ত এরা বাপ-দাদাদের নিয়ে আলিবাবার নাচ শুরু ক'রে দেবে!

দেবে কি বলছি, দিচ্ছেও! আপনাদের ভাগ্যি ভাল তাই এ সব হঙ্গামা পোয়াতে হয় না, কিন্তু আমি গেলাম একপাল বাঁদরকে নিয়ে। পড়ার কথা বলুন—পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। ফুটবল, ক্রিকেট সিনেমার বিষয় আলোচনা করুন, মনে হবে জীয়ন্ত অমরকোষের সঙ্গে কথা কইছি। সব মুখস্ত! ভাল বক্তৃতা হোক, সেখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে পালাবে। দৈহিক পরিশ্রম করতে বলুন সেটা বুড়োদের ঘাড়ে চাপিয়ে সরে পড়বে। পাঁচটা ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করতে বলুন, প্রলাপ বকবে, নয় তাঁর পেছনে এমন টিট্‌কিরি কাটতে শুরু করবে যে, তাঁদের তখন ভূলোক ছেড়ে গোলোকে পালাবার বাসনা জাগবে। বাজারে যেতে বলুন, রেগে খার হয়ে উঠবে, সিনেমার টিকিট কিনতে দিন কিম্বা ফুটবল মাঠে পাঠান সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত ঠিক এক-ঠ্যাংয়ে ব্যালেন্স রেখে দাঁড়িয়ে থাকবে।

আমি যদি এর বিরুদ্ধে কথা বলি—তাহ'লেই লোক খারাপ, খিট্‌খিটে, বিংশ শতাব্দীর স্থাণু জড় সেকেলে। পৃথিবী যে বদলে যাচ্ছে তার খবর রাখিনা। সকালবেলা আপিস যাই, বাজার করি আর সন্ধেবেলায় ঘুট্-ঘুট্ করে

বাড়ি ফিরে আসি এই ত আমার কর্ম, অতএব আধুনিকতার মর্ম আমি কি বুঝি ?

স্বীকার করছি বাবা, আমি কিছুই বুঝি না। কিন্তু দাঁড়াও, আগে সরি—তারপর সংসারের মর্ম বুঝতে তোমরা শুধু গলদঘর্ম হবে না, চর্ম ফেটে ধর্মতলার মোড়ে শুধু লোকের পকেট মারার কাজ ছাড়া আর কাজ পাবে না—এই বলে গেলুম, হ্যাঁ !

ছেলেপুলের পরিবর্তন

চোখের সামনেই দেখলুম পৃথিবীটা কি রকম বে-প্যাটার্ন ভাবে বদলে গেল। মানে, আগেকার ধরণ-ধারণ আচার-ব্যবহার সব ত বদলেছেই উপরন্তু ছেলেমেয়ে লোকজন আত্মীয়স্বজন সব যদি একটু খাসাভাবে বদলায় তবু একটু মনে আশা থাকে, কিন্তু ক্রমশঃ বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে আমাকে একেবারে কোণঠাসা ক'রে ফেলেছে। স্রেফ নিজের বাড়ির কাণ্ড দেখেই মুণ্ডু ঘুরে যাচ্ছে, তা অপরের কথা কি বলবো বলুন!

এক এক সময় ভাবি, কাদের জন্য মাথা ঘামিয়ে মরছি। ছোট্ট প্যাঁট্‌কাটা থেকে ধাড়ী রামছাগলগুলোর পর্যন্ত মেজাজ একেবারে মিলিটারি। ভদ্রতা, সহবৎ, শিক্ষা কিছু নেই—কাজকর্মের বালাই ত বহুদিন চুকে গেছে। যদি বলি বাড়ির বাজারটা রোজ এনে একটু উপকার কর—বয়ে যাচ্ছে! সারাদিন শুধু হুজ্জুৎ ক'রে সন্ধ্যেবেলা বাবুরা বাড়ি ফিরবেন, আর আমি এঁদের ঋণ শোধ করবো!

সিগারেটওয়ালা এল, তাকে তিন মাস কে পয়সা দেয়নি, শেষকালে সে দু' পয়সার বিড়ি পর্যন্ত ধার দিতে নারাজ হতেই তাকে গালিগালাজ ক'রে দোকানের যথাসর্বস্ব লুটে তার বাঁ চোকের ওপর একটি প্রকাণ্ড আব গজিয়ে দিয়ে একবাবু সরে

গেলেন,—আপিস থেকে বাড়ি ফিরতেই শুনলুম, ভুঁটেবাবু এই কাণ্ড ক'রে বসে আছেন। আমাকে পঁচিশ টাকা খেসারৎ দিতে হল। বাবু বাড়ি ফিরতে জিজ্ঞেস করলুম, হ্যারে বাঁদর, পানওয়ালাকে খামকা ঠেঙালি কেন? অমনি মুখে জবাব যুগোনো—দাঙ্গার সময় বেটার দোকান বাঁচিয়ে দিয়েছিলুম না?

যেহেতু দাঙ্গার সময় তাকে চাঙ্গা করে রেখেছিলেন সেইহেতু এখন নিত্যি তার সঙ্গে হাঙ্গামা করার ওর কপিরাইট জন্মে গেছে। মানে বজ্জাতিটা বুঝুন! পয়সা না থাকে নেশা করা কেন? যাই হোক, এ বিষয়টা নিয়ে ত আর ছেলে-পুলেদের সঙ্গে সামনা সামনি আলোচনা করা যায় না—গিন্নীকে বললুম, আচ্ছা, তোমরা ছোঁড়াগুলোকে ওগুলো খেতে বারণ করনা কেন? তিনি খিঁচিয়ে বললেন, বয়েস কালে ছেলেপুলেরা ও সব না খেলে আর খাবে কবে? তার আবার বলবো কি? বলে, আজকাল কত মেয়ে ঐ সব খেয়ে ভুস্তিনাশ ক'রে দিচ্ছে—ওরা ত ছেলে!

আমি ক্ষেপে বলে উঠলুম, কভি নেহি, তু' চারজন হাই-জাম্প দেওয়া মেয়ে সিগারেট টিগারেট হয়তো খেতে পারে, তা বলে কেউ বিঁড়ি টানে না। তিনি বলে উঠলেন, আজ না টানলেও পয়সার টান পড়লে তু'দিন পরে ওরাও টানবে। এই নিয়ে চুলোচুলি! শেষে তিনি ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, বেশ করবে খাবে! কত তুধ, ঘি, মাছ-মাংস ছেলেপুলেদের

নিত্যি এনে খাওয়াচ্ছ তার ঠিক নেই—ওরা দু'টো একটা কি খেলে না খেলে অমনি তোমার চোখ টাটালো ?

আমি ক্ষেপে বললুম, খাক্‌গে মরুগগে, খেয়ে পয়সা দেয় না কেন ? তার জবাব সঙ্গে সঙ্গে। ওরা কোত্থেকে পাবে, ওদের রোজগারের ব্যবস্থা করেছ ? মানে শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হল, মূলে সেই আমার দোষ! দোষ ত সংসারে শ্রীদুর্গা ফাঁদা অবধি ক'রে আসছি—তা আমিও হাড়ে হাড়ে কি আর বুঝছি না ? কিন্তু রোজগারের ব্যবস্থা করবো কোত্থেকে, কটা বামুন কায়েতের ছেলের আজকাল চাকরি জোটে বলুন ত ? তাই একখানা মুদীর দোকান ক'রে দিলুম, তাও টিঁকলো না। চিনির দাম চড়তে তিন নাগরি গুড় দিয়ে চা খেয়ে খেয়ে বাবুরা কারবার লাটে তুলে দিলে! এ ছাড়া দুপুরবেলায় ঘুম আছে, দোকানে কেউ যেতে পারবেন না, বিকেলে সিনেমা, অতএব লোকজন যা করে। তারা একেবারে দফা সেরে দিলে—বাবুরা পুনরায় ঘরে বসে আয়েস করছেন। তাও চুপচাপ থাক্‌, তা নয়।

ইতিমধ্যে এক কাণ্ড! সেদিন দেখি হুড়কোর পেছন পেছন মোড়ের চা-ওয়ালা হাঁ, হাঁ ক'রে ছুটে আসছে! কি, ব্যাপার কি ? শোনা গেল, বাবু রোজ দু' কাপ ক'রে চা খাবেন, দাম দেবেন না—সেদিন সে বাকী পয়সা চেয়েছে অতএব আর যায় কোথা, হিড় হিড় ক'রে তার কেটলি শুদ্ধ বাড়িতে টেনে নিয়ে এসেছে। আমি আবার তার গায়ে হাত

বুলিয়ে চায়ের দাম, কেটলী সব ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি, তাই রক্ষে! আচ্ছা, এরা ক্রমশঃ হচ্ছে কি? এই নিয়ে বকাবকি কম করেছি? কিন্তু যতই বলা হ'ক, এরা কাঁচ-কলা দেখিয়ে নিজেদের শলা পরামর্শ মত চলবে—আপনার জ্বালা বাড়লেও সেদিকে দৃষ্টি দিতে তাদের বয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টিছাড়া অঘটন ঘটাতে এরা ওস্তাদ।

তা বলে বাপ দাদা খুড়ো জ্যাঠা মায় মাস্টার পর্যন্ত কাউকে রেয়াৎ করবে না? কি আতান্তর ব্যাপার বলুন্ ত? সেদিন শুনলুম ন' বাবুর সেজ ছেলের পরের যেটি, ফালতুটা ইস্কুলে পড়া বলতে পারে নি। মাস্টার বকেছে। আর যায় কোথা? তারপর দিনই হঠাৎ মাস্টারের ঘাড়ে

ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমার নস্যির ডিবে থেকে এক মুঠো নস্যি নিয়ে তাঁর নাকে গুঁজে দিয়ে এল। সে ভদ্র-লোকেরও গেরো—সেই সময় আবার তাড়াতাড়ি হেঁচ্ছো হেঁচ্ছো ক'রে হেড্মাস্টার মশায়ের ঘরে ঢুকে নাক মুখ দিয়ে সহস্র ধারায় পিচকিরি ছোটাতে লাগলেন—সে ভদ্রলোক নিজের মুখ চোক বাঁচাতে কেৎরে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন, মাস্টার মশাইও নালিশ

জানাতে তার পেছনে ছুটলেন, অন্যান্য মাস্টাররাও কি হল, কি হল, বলে তাদের দু'জনের পেছনে দৌড়তে লাগলেন—সঙ্গে সঙ্গে সব ক্লাশ থেকে ছোকরার দল বেরিয়ে এসে পেছনে হাততালি দিতে স্বুরু করলে।

আচ্ছা এ কি?

ফালতুর বিরুদ্ধে নালিশ শুনে সন্ধ্যেবেলা যাচ্ছেতাই ক'রে বললুম, হ্যাঁরে গরু, তোরা গুরুকে মানিস্ না—তোদের দু'বেলা জাব্নার ব্যবস্থা করবার জন্যে তাহ'লে এত খেটে মরছি কেন? তার উত্তরে আমার ওপরেই চোপা, আমায় শক্ত শক্ত পড়া জিজ্ঞেস করে কেন?

আমি বললুম, পড়া আবার শক্ত কিরে বাঁদর? তার উত্তরে কি বললে জানেন? তুমি দু'টোর উত্তর দাও না, দেখি!

গা জ্বলে গেল হতভাগার কাথা শুনে, বললুম, নিয়ে আয় হতচ্ছাড়া, দেখি কিসের উত্তর না দিতে পারি? ষষ্ঠমানের পড়ার উত্তর দিতে পারবো না আমি? মশাই, বলতে না বলতে দু' ঝাঁকা বই

নিয়ে এসে সামনে ঢেলে দিলে। দেখলুম, সেগুলো রপ্ত করতে পারলে প্রায় আইন-স্টাইনের সমকক্ষ হওয়া যায়। নিজের মান বাঁচাতে শেষে পালাবার পথ পাই না। তবু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলুম, তাহ'লে পাশ করবি কি ক'রে? সেও মহাস্ফূর্তির সঙ্গে বলে গেল, কেন, টুকে-টুকে। বুঝুন কি রকম শিক্ষা পাচ্ছে।

আসল কথা হয়েছে কি জানেন? আমরাও ওদের ঘাড়ে রাজ্যের জ্ঞান চাপিয়ে বিদ্যে দিগ্‌গজ না ক'রে ছাড়বো না, ওরাও গজগজ করতে ছাড়বে না—ফলে অবিরত গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ বাধছে। তার ওপর যুদ্ধ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হুজুগে মনটা গেছে চলকে। এক মুহূর্ত সুস্থির থাকা কুষ্ঠিতে লেখে নি, তাই দেখুন সগুষ্টি আমি মারা পড়তে বসেছি। যদি বলেন, আমাদের বাড়িতে কি ছেলেপুলে নেই, তারা ত কেউ তোমার বাড়ির মত উদ্ভুট্টে নয়—আসলে তুমি নজর রাখ না, তাই। তাহ'লে বলবো আর কত নজর দোব বলতে পারেন? এত নজর দিয়েও ত কেউ কাহিল হচ্ছে না, শুধু আমার বিরুদ্ধেই লোকে খুঁত বার করতে খুঁত-খুঁত করছে। তাহলে উপায় কি?

সেদিন আমাদের পাড়ায় এক শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোক লাইব্রেরীর উদ্বোধন করতে এলেন, তাঁর পেছনে স্রেফ শেয়াল ডেকে এমন অবস্থা করলে যে, ভদ্রলোকের বোধহয় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করবার ইচ্ছে হল। এ কার্যের নাটের গুরুটি কে

সংবাদ নিতে গিয়ে শুনলুম, ন' বাবুর ছোট ছেলে ন্যাংচা। পরে দেখা হতে জিজ্ঞেস করলুম, হ্যাঁরে গর্দভ, এ রকম করলি কেন? উত্তরে সটান বলে গেল, ও যে অনেক ভাল ভাল সব কথা বলছিল—তাই বেটাকে বসিয়ে দিলুম। অর্থাৎ এ যুগে এঁদের কাছে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এসে ভাল কথা বলতে গেলেও হয় এঁরা শেয়াল ডাকবেন, নয় পেছন থেকে গাঁট্টা মেরে বসিয়ে দেবেন। অভিনব অভিজ্ঞতা—আমায় অর্জন করতে হচ্ছে মশাই।

ঘটকালিতে ঘাট

আর বলেন কেন? মর্চ্ছি নিজের জ্বালায় এর মধ্যে আমার বুড়ী ঠান্‌দি অর্থাৎ আমার মায়ের এক মাসতুতো মাসী, সেদিন আমার ওপর ঘটকালি করার ভার চাপাতে হাজির হলেন। একটি নাতির মুখ না দেখে ম'লে বুড়ীর নাকি লজ্জায় যমরাজের সামনে গিয়ে ঘোমটা দিয়ে ঘুরতে হবে। তাঁর

ছোট নাতি কাৎলা বিয়ে করবে না বলে বেঁকে বসেছে অতএব আমাকে তার মান ভাঙ্গিয়ে বিয়ে দেওয়া চাই।

আমি পঞ্চাশ হাজার বার ক'রে বললুম, দেখ ঠানদি, পৃথিবীতে বিয়ের অন্যান্য সব কাজ করা যেতে পারে কিন্তু ঐ ঘটকালির ব্যাপারে শর্মা নেই। কেন নেই, তার যথেষ্ট কারণ আছে।

ঘটকালি তু' চারটে করতে গিয়েছিলুম জীবনে কিন্তু তার ফলে বছরখানেক বাড়ির বাইরে বেরুতে পারিনি—সমস্ত দোষ চাপলো আমার ঘাড়ে : কন্যাপক্ষ, বরপক্ষ তু' দলই প্রাণভরে আমাকে ত গালাগাল দিলেই উপরন্তু স্বয়ং বরেরা আমায় বাড়ির কাছ দিয়ে যেতে দেখলে লাঠি নিয়ে তাড়া করতো আর কনেরা এ-সব কিছু করতে না পেরে, রাস্তা দিয়ে গেলেই —ঐ যে মুখপোড়া পান চিবুতে চিবুতে যাচ্ছে, বলে মাথায় ট্যাঙ্কের জল ঢেলে দিত। মানে, যে-কটার বিয়ে দিলুম, তাদের কারুর সঙ্গে কারুর বনলো না। প্রত্যেকেরই দেখলুম —নিজের স্বামী বৌ ছাড়া যে-গুলি হাতছাড়া হয়ে গেছে সেইগুলোকেই বেশী বেশী ভাল লাগতে শুরু করেছে। তাই এইসব কেলেঙ্কারীর পর থেকেই আমি আর কারুর বিয়ের কথায় থাকবো না বলে প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলুম।

বুড়ীকে ডেকে বলে দিলুম, মাপ্ করো, আমি ওতে নেই।

বুড়ী নাছোড়বান্দা—নড়বে না। সে এক বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ড! কেবল বলে, না দাদা, তুই ঠিক পারবি!

আমি তবু বোঝাতে বলে উঠলুম, ওরে বাবা, সে যদি বিয়ে করতে রাজীও হয়, তাহ'লেও আমি তার বিয়ে দিতে পারবো না। মেয়ে কোথায়? ভাল ভাল যে কটা মেয়ে বাঙলা দেশে ছিল, হয় তারা সব সিনেমায় নেমে পড়েছে আর নয় নিজেরাই বরেদের বঁড়শিতে গেঁথে বসে আছে।

তোমার আদরের নাতির কনে খুঁজতে গেলে এখন বন বাঁদাড়ে গিয়ে আমায় ওৎ পেতে বসে থাকতে হবে। বাজার খুব মন্দা!

আমার কথা শুনতে তার বয়ে যাচ্ছে। তবু সেই বকুনি—না দাদা, তোর হাতে আবার মেয়ে নেই? বলে, নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে তুই কত মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছিস শুনতে পাই, ওরি মধ্যে একটা দেখে শুনে কাৎলার সঙ্গে আর জুড়ে দিতে পারবি না?

শুনলেন কথা? দিনরাত আমি আর ঘোরবার জায়গা পেলুম না, শুধু মেয়েদের পেছন পেছন টো টো করে ঘুরছি? আমার আত্মীয় স্বজনের আমার সম্বন্ধে কি উচ্চ ধারণা একবার দেখে যান। মানে, শেষ পর্যন্ত ক্ষেপিয়ে তুললে!

বাধ্য হয়ে শেষে বলতে হ'ল, বেশ বাবা দেখবো, তুমি এখন বিদেয় হও! মনে মনে বললুম, তোমাব কাৎলার জন্যে মিরগেল একটা খুঁজে বার করতে প্যারি ত ভাল, নইলে ওকে জলেই ভাসাবো।

যাবার সময় খুব খুশী মনে বুড়ী চলে গেল। কিন্তু মাথার দিব্যি দিয়ে যেতে ভুললো না।

বাধ্য হয়ে মশাই, মেয়ে দেখা শুরু করলুম, দু' একটি পছন্দও হল কিন্তু কাৎলা গভীর জলের মাছ, সে চট্ ক'রে ঘাটে উঠে ঘাই মারবে কেন? তার বায়নাক্কা কত! দশ হাজার টাকা যৌতুক দিতে হবে, বিলেত পাঠাতে হবে,

সেখানকার খরচ যোগাতে হবে, তবে তিনি দয়া ক'রে রাজী হবেন। তাঁর গুণ কি! ম্যাট্রিকটা কোনমতে চোঁয়া ঢেঁকুর তুলতে তুলতে পাশ করেছেন, কোট প্যাণ্ট্ পরেন, সিগারেটের টিন নিয়ে ঘোরেন, পার্টিতে যান, বেভুল ইংরিজি বলেন, তথাকথিত অনেক সোসাইটি গার্লের পাশে হেসে হেসে দাঁড়ান, তারা একটু হাসলে মাথা ঘুরে তাদেরই ঘাড়ে হুম্ড়ি খেয়ে পড়েন এবং তাদের হিল তোলা জুতোর টক্কর খেয়েই আর একজনের পাশে সোফায় গড়িয়ে কোঁকর-কোঁ ডাক ছাড়তে থাকেন। এ হেন রত্ন কার গলায় ঝোলাবো—বলুন!

ইংরেজ চলে গেছে কিন্তু তাদের ল্যাজের যে অংশটা এদেশে ছেড়ে রেখে গেছে তার ঝাপটায় চক্ষু অন্ধকার! ডেকে বললুম, হ্যাঁরে কাৎলা, এক গেরস্থর একটি বেশ ভাল মেয়ে আছে, ভদ্রলোক বড় বিপন্ন, তাহ'লেও হাজার

দু'য়েক দেবে, তুই একবার মেয়েটাকে দেখ্‌না!

সে চোখমুখ পাকিয়ে আমায় এই মারে ত এই মারে।

হোয়াট ? ডোণ্ট্ ব্রিং দোজ র‍্যাজাটেস্ ! যারা দু' হাজার টাকার বেশী এ বাজারে মেয়ের বিয়েতে খরচা করতে পারে না—তাদের আমি মানুষ বলে মনে করি না। তাদের মেয়ে হয় কেন ? হোয়াই ডু দে লিড্ উইথ—

বাধা দিয়ে বলে উঠলুম, বেশ বাবা, মেয়েটাতো অনেকদিন আগেই হয়ে গিয়েছে, তার ত আর চারা নেই—বারণ করবারও উপায় নেই, তোর ইচ্ছে না থাকলে তুই বিয়ে করিসনি—ক্ষ্যান্ত দে ! তবে বাবা বাঙলায় দু'টো কথা বল্, চেঁচাস্নি। আমি আবার সব-কিছু ভাল বুঝতে পারি না—ও ভাষাটায় একটু কম্‌জুরী আছি।

অনেক কষ্টে তখনকার মত থামাই, আবার আর একদিন লজ্জার মাথা খেয়ে গিয়ে বলি, ওরে আর একটি মেয়ে আছে, দেখতে শুনতে মাঝারি, দেবে থোবেও ভাল—তুই নয় একেই বিয়ে কর্ !

আবার সেই—হোয়াট ? ইজ শী এডুকেটেড্ ? সে খুব লেখাপড়া জানে ? একম্‌প্লিশড্ ?

আমি বললুম, তা ইংরিজি একটু আধটু জানে বৈ কি—খামের ওপর ঠিকানা লেখা থাকলে পড়তে পারে—এই ত যথেষ্ট।

সঙ্গে সঙ্গে একেবারে, নো—নো—নো। শেষে রাগ হয়ে গেল, মাথা গরম ক'রে আমিও বলে ফেললুম, থাম্ বাবা ! বেশী শিক্ষিত মেয়ে নিয়েই বা করবি কি ? তোর নিজের

দিকটাও ভেবে দেখ্। শেষরাত্তিরে একটা বানান জিগ্যেস কল্লে´ত ঢোঁক গিলবি—তাতেই ত কুরুক্ষেত্তর বেধে যাবে।

মশাই, বলে বিপদ্! একঘণ্টা ধরে শুধু নিজের কোয়ালিফিকেশন্ বোঝাতে প্রায় শ' খানেক ইংরিজি বানান বলে গেল। সে যে কী বললে আমি তার একবর্ণও বুঝলুঁম না। প্রাণ যায়!

শেষে হাতযোড় ক'রে আমি বললুম, দোহাই তোর থাম্! আমি তোর জন্যে একেবারে ডিক্সনারি-মার্কা মেয়ে নিয়ে আসছি, কোন ভাবনা নেই!

তাই নিয়ে এলুম। সে আবার চেহারায় বনলো না। আচ্ছা বলুন দেখি কি কাণ্ড! শেষে বলে কি জানেন?

আমি মেম বিয়ে করবো।

আমি বললুম, তাকে নিয়ে তুই ঘর করতে পারবি?

তার উত্তরে বলে, যদি লাভ (Love) হয়, কেন পারবো না?

বললুম, বটে আর কি! অনেক লাভ লোকসান দেখা আছে, ওরে হতভাগা ট্রানশ্লেশন ক'রে ক'রে কি প্রেম হয়? সে যা বলবে তাড়াতাড়ি ঠিক তালমাফিক্ তুই উত্তর দিতে না পারলে লাভ্ বাপ্ বাপ্ বলে পালাবে। ওসব আইডিয়া মগজ থেকে সরিয়ে দিশীর দিকে নজর দে! খাবে কম, খাট্‌বে বেশী, জোর রাগ ক'রে একটু নাক ফোলাবে কি সর্দি ঝরাবে, নয় একটু ফোঁস ফাঁস করবে, আবার পরে হেঁচ্‌কি দিয়ে

একটু কাছে টানলেই ঘুঁটের মত গায়ে লেপটে পড়বে—সব দিক দিয়েই সুবিধে, ভেবে দেখ্!

ভাবতে তার বয়ে যাচ্ছে। বরং উত্তরে বলে উঠলো—ক্যাডাভ্যারাস্।

আমিও থাকতে না পেরে স্পষ্ট কথা বলে ফেললুম যে, তুমি কি চিজ্ হে? কলকাতায় এক কাঠা দেড় ছটাক জমির ওপর নয় একটা বাড়ি আছে আর ব্যাঙ্কে বাবার হাজার তিনেক টাকা জমা আছে, এতে তোমারই বা অত চাল কিসের?

সাহেব গর্ গর্ ক'রে রেগে বেরিয়ে গেলেন। আবার মাসতুই পরে সেই ঠানদির আগমন ও সুমধুর আপ্যায়ন, কি করলি দাদা? ওকে ঘরবাসী করে দে ভাই ইত্যাদি।

আমি সাফ বলে দিলুম, ঐ রকম একটা উল্লুকের বিয়ে আমি দিতে পারবো না। ও নিজে পারে করুক।

ঠানদি বল্লে, না ভাই, নিজে সে আর কিছু করবে না—এখন একেবারে ঠিক্ হয়ে গেছে!

অবাক্ হয়ে জিগ্যেস করলুম, ঠিক হয়ে গেছে মানে?

বুড়ী মানে বুঝিয়ে যা বললে তার মোদ্দা কথাটা এই যে, কাৎলা দু'চার জায়গায় নাকি মেয়ে দেখতে গেছলো কিন্তু আজকালকার লোক সব পাজী ত—তাই বাছাকে মেরে কারা খিদিরপুরের পোলের কাছে একেবারে শুইয়ে দিয়ে গেছলো, এখন বাড়িতে ঝোল-ভাত পথ্যি পেয়ে নাকি কেঁদে

কেটে বলছে যে, এবার তোমরা যাকে বিয়ে করতে বলবে তাকেই করবো, সে মেয়েছেলে না হলেও বোধহয় আপত্তি নেই—এই ভাব আর কি !

বুঝলুম, কোথায় বেমক্কা জায়গায় ইয়ার্কি মারতে গিয়ে ঠেঙানি খেয়ে এসেছে আর কি ! হাসিও পেল দুঃখুও হ'ল।

যাই হক মশাই, আবার সন্ধানপত্তর ক'রে, ঘটক লাগিয়ে একটি মেয়ে ঠিক করলুম, দেখতে শুনতে ভাল, দিলে থুলেও মন্দ নয়, আমারই এক বন্ধুর মেয়ে। দিব্যি বিয়ে চুকে গেল।

বছর দু'য়েক কাৎলা একেবারে জলের ওপর ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগলো। বলতে নেই, গুটি দু'য়েক ষষ্ঠীর বাছাও নেচে কুঁদে ঘুরতে লাগলো। তারপর—ও মশাই, কী সর্বনাশ ! একদিন কনের বাপ এসে আমায় এই মারে ত এই মারে। যাচ্ছেতাই গালাগাল ! কি ব্যাপার ?

—আর ব্যাপার ! কার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছ ? ওতো আগে দু' জায়গায় মালা বদল ক'রে এসেছে। সেদিন বেহালায় কার বাড়িতে হৃদয়ের তার

বাঁধতে গিয়েছিল, মালাবদল হয় হয়, এমন সময় খোঁজ পেয়ে তারা নাকি কান মুচড়ে দফা নিকেশ ক'রে দিয়েছে। বন্ধু আরও কীর্তিকলাপের খোঁজ পেয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে আমার বাড়ি এসে হাজির, আর তারস্বরে চীৎকার, তুমি বন্ধু হয়ে এ আমার কী সর্বনাশ করলে! তুমি কি কিছু জানতে না, বলতে চাও?

আমি ত থ।

আচ্ছা আমি কি করবো বলতে পারেন? আজকাল কার গলায় কে কোথায় মালা ঝোলাচ্ছে তা কি আগে থেকে কোনো ইয়ে জানায়? আগেকার মত আটচালা বেঁধে, ছাঁদনাতলা তৈরী ক'রে, সানাই বাজিয়ে বিয়ের পালা ত এখন নেই বললেই হয়, বরং দোরতালা বন্ধ করেই যা-কিছু সব ব্যাপার চুকে যাচ্ছে—তাহ'লে আমি ভেতরের খোঁজ খবর সব পাই বা কোত্থেকে বলুন? ঐজন্যে ত ও-কাজ ছেড়ে দিয়েছিলুম, কিন্তু বুড়ী যে তেড়ে ধরলে। উঃ! কী কেলেঙ্কারী ভাবুন!

যাক্, কি আর করবো, বরাত মন্দ, লোকের অভিশাপ কুড়োতেই হবে। গালির হাত থেকে নিস্তার ত নেই জীবনে—তবে এটা ঠিক জানবেন, ঘটকালি আর কখনও করবো না। ফের্ যদি করি, তাহ'লে আমায় হাতীবাগানের মোড়ে ঘাড় ধ'রে আমার একগালে চূণ আর এক গালে কালি লেপে দেবেন—এটুকু জোর গলায় বলে যাচ্ছি।

জোচ্চুরির আর্ট

আচ্ছা, সারা দেশে চোরা কারবার করা বহু ভদ্রলোকের একটা পেশা ও নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে—এ সম্বন্ধে বলার কিছু নেই ; স্বদেশের টাকা স্বদেশবাসীরাই হাতাচ্ছে, ভাল কথা— যাই হ'ক দিশী সিন্দুকেই সেগুলো উঠ্‌ছে, দিনকাল খারাপ পড়লে ওসব কেউ পুঁজি ক'রে রাখতে পারবে না, বেরিয়ে আসবেই জানি কিন্তু এই করতে করতে জোচ্চুরির পরিধি এমন বেড়ে গেছে যার ফলে মনে হচ্ছে, যে সমাজে থাকতে গেলে আর্ট হিসেবে যদি ওটা আমরা প্রত্যেকে শিক্ষা না করি তাহ'লে বাড়ির চৌকাঠের বাইরে আর পা দেওয়া বোধহয় অসম্ভব হয়ে উঠবে।

সত্যি কথাটা সব সময় কেউ বলে না, মায় আমিও না—কারণ চক্ষুলজ্জা, বিপদ ও নানা হাঙ্গামার ভয়, তবে মিথ্যে কথার একটা সীমা থাকা উচিত ত ? মিথ্যে কথা তখনই সত্যিকার মিথ্যে কথা হয়ে ওঠে যখন সেটা সমাজের কন্‌সেশন রেট্ ছাড়িয়ে যায়। বর্তমান যুগে শতকরা নিরেনব্বই জন কিন্তু সীমান্ত রেখা পার হয়ে বসে আছে। এখন আজাদ মিথ্যে-ফৌজ যে ভাবে চতুর্দিকে হানা দিতে শুরু করেছে, তাতে শুধু চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবার উপক্রম হচ্ছে, না সকলকে

একেবারে কানা করে দেবার আয়োজন কর্চ্ছে। মনে করুন, আমার মত নিপাট ভালমানুষ লোক, যে ঘর সংসার, খবরের কাগজের কেচ্ছা, ছেলেদের পেটের অসুখ, গিন্নার হাতমুখ নেড়ে কাচের চূড়ীর ঝন্‌ঝনানি ছাড়া আর কোন বিষয়ের খবর রাখে না—তাকেও রেহাই দেবে না।

আর বলে নিজের ভাইপো ভাগ্নেদের সামলাতে আড়াই হাত জিব বেরিয়ে পড়ছে, এর ওপর মশাই এক বেটা সাজা ভাগ্নে বেরিয়ে কি ফ্যাসাদে ফেলেছে জানেন?—দু'দু'বার বাড়ী সার্চ হয়ে গেল—লোকের কাছে বে-ইজ্জতির একশেষ, পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনের কাছে মুখ দেখাবার উপায় নেই।

আমার ভাগ্নে বলে পরিচয় দিয়ে কে এক চিত্ত-চকোর চক্রবর্তী, গীতার শ্লোক শ্লোক ঝেড়ে, কোন এক স্থানে বিশেষ ধর্মভাবের পরিচয় দিয়ে, পাঁচটি ভদ্রলোকের কাছথেকে হাজার দু'য়েক টাকা হ্যাণ্ড নোটে ধার করেছেন, তিনটি লোকের সাইকেল সারিয়ে দেব বলে রামীর মার খেল হিসেবে সেগুলি হাওয়ায় উবিয়ে দিয়েছেন, রেডিও সেট সারিয়ে দেব বলে তাল দিয়ে একটি দামী মাল নিয়ে সরেছেন এবং কোন জলসায় আমার ধ্রুপদ গাইবার বিশেষ নাকি প্রয়োজন হয়ে পড়ায় আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে তাঁর নতুন হারমোনিয়াম হাতিয়ে হাওয়া হয়েছেন। এখন যাঁর হারমোনিয়ম তিনি নিত্য সকাল বিকেল আমার বাড়ীতে এসে এমন গলা সাধতে

শুরু করেছেন, যার আওয়াজে মনে করুন তিনতলা থেকে দলে দলে লোক এসে একতলায় ভাড় জমিয়ে ফেলছে।

পাড়া-প্রতিবেশী মুখ টিপে টিপে হাসছে। অভিজ্ঞ-ব্যক্তিরা রকে বসে বলতে শুরু করেছেন, হুঁ-হুঁঃ ব্-বাবা, যা রটে তার আর কিছু কিনা ঠিক বটে! নিন, ঠেলা সামলান!

মশাই, সেদিন কাকপক্ষী ডাকার আগে পাহারাওয়ালারা এসে দাঁড়াতে ভাবলুম যে, বাড়ীর বাবুরাই কোন একটা বিশেষ কীর্তি কোথায় ক'রে এসেছেন বোধহয়—শেষে শুনি খোদ কর্তাদেরই সন্দেহ আমার ওপর—মামা-ভাগ্নেতে মিলে নাকি এই কারবার শুরু করেছি। পরিশেষে অবশ্য প্রমাণ হ'ল এ কোন জোচ্চোরের কাণ্ড, কিন্তু প্রমাণ করাতে জান খান্ খান্ হয়ে যাবার দাখিল। পুলিশ এমনিতেই লোককে পুলটিশ বেঁধে ছেড়ে দেয়, তার ওপর সন্দেহ করলে রক্ষে আছে!

ঠিকুজী, কুষ্ঠী, নাম, গোত্র, পেশা, নেশা, কার সঙ্গে কবে কোথায় ভালবাসা হয়েছিল সব খবর ত নিলেই, উপরন্তু থালা, ঘটি, বাটি হাঁড়ি পর্যন্ত হাতড়ে হাতড়ে দেখে গেল তার মধ্যে চোরাই মাল কিছু আমি রেখেছি কিনা। তারপর আত্মীয়-স্বজনের নাম ধাম ত নিলেই উপরন্তু সই সাবুদ কিছু নিতে বাকী রাখলে না। প্রতিদিন হন্তদন্ত হয়ে তদন্ত করতে এসে বাবুরা যে রকম দন্ত কিড়িমিড়ি শুরু করলেন তার ফলে মনে হল বলি,—মহাশয়রা শান্ত হন, আর আমায় মনে মনে বাপান্ত করবেন না, যদি কিছু আপনাদের হাতে ফাইন গুঁজে দিতে হয় ত বলুন দিয়ে দিচ্ছি, আর টানা-পোড়েনে রাজী নই। যাই হক, মাস তিনেক ধ'রে এইরকম চললো, তারপর প্রায় নাভিশ্বাস উঠতে তখন এঁদের বিশ্বাস হল যে না—ওনামে আমার কোন আত্মীয় নেই।

আচ্ছা দেখুন ত আক্কেল!—আমার ভাইপো ভাগ্নের নাম কে না জানে বলুন? দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে ধুমসো, হ্যাংচা, হুড়কো, ভুঁটে, বিটকেল্‌কে পৃথিবীর লোক চিনে গেছে—এরা ছাড়া, ঐরকম চিত্ত-চকোর, মনপ্রাণ-চোর, ট্যারা-আঁখিঠোর, ত্রিভঙ্গ-ডোর বলে পরিচয় দিলেই ত লোকের বোঝা উচিৎ যে বেটারা ডাহা জোচ্চোর, বিরূপাক্ষের সাতগুষ্টির কেউ নয়—তা না ভেবে পুলিশ ভেবে বসে রইলো আমি এদের সঙ্গে এই কারবার শুরু করলুম?

আর যেগুলো ঠ'কলো সেগুলোই বা কি? আসল নকল বুঝিস না?

এক ভদ্রলোক খিঁচিয়ে বললেন, কেন বাজে বকছেন মশাই। আজকাল কে সাধু কে চোর বোঝা যায়? এখন আত্মীয়দেরও বিশ্বাস নেই। দেশ থেকে এক মাসতুতো পিসেমশাই এসে তিনদিন বৈঠকখানা ঘরে ছিলেন। মশাই, গদীর তলায় তিনখানা ভাল শীতকালের কম্বল ছিল, কোন্‌দিন দুপুর বেলায় সেগুলো পর্যন্ত বেচে দু'পয়সা কামিয়ে নিয়ে সরে গেছেন। চোরা বাজারে দু'মাস পরে নিজের নামের চিহ্নিত্‌ দেওয়া সেই জিনিসই আবার কিনে আনি। বিশ্বাস তাহ'লে কাকে করবো বলুন?

উঃ! কি অবস্থা হয়েছে ভাবুন! চুরির প্রবৃত্তি, জোচ্চুরির পরিধি ক্রমশ লোকের পিসেমশাইদের কাছে পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। তাহলে আমার চতুর্দিকে অজান্তে যে এইরকম আরও ডজনখানেক ভাইপো, ভাগ্নে, বারমেসে ফল হয়ে ঝুলতে শুরু করবে না তারই কি স্থিরতা আছে? এতো বড় ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্র' সারা ভারতে চোব সর্বত্র বলা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না।

ডাকাতি, রাহাজানি, লোককে অজ্ঞান করিয়ে তাকে নিয়ে পিট্টান, এসব সাংঘাতিক ব্যাপারে হয়তো সবাই যাবে না কিন্তু ট্রামে, বাসে, দোকানে, বাজারে, ধর্মস্থানে হঠাৎ গায়ে

পড়ে আলাপ করার মধ্যে, জিনিস সস্তায় আনিয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে, টাকায় পাঁচ টাকা লাভ দেব বলে, মন্ত্রীদের কাঁধে হাত দিয়ে চলি বলে রীতিমত ধাপ্পা দিয়ে, নিদেন সে-সব কিছু না পেরে বিরূপাক্ষের ভাগ্নে-ভাইপো সেজে রাস্তায় যদি হানাদারদের মত এই রকম ব্রাদাররা অবিরত বেরোতে থাকে তাহ'লে আমি প্রাণ বাঁচাই কি ক'রে বলতে পারেন ?

তার ওপর এই দেশ—লোকের কুচ্ছো একটা পেলে রক্ষে আছে, সবাই পুচ্ছ তুলে ধেয়ে আসবে কৈফিয়ৎ নিতে। হ্যাহে, কি জন্যে তোমার বাড়ী পুলিশ এসেছিল, কি কি মাল পাওয়া গেল, সবই বাইরে ফেলে রেখে ধরা পড়ে গেলে না কিছু সরিয়ে রেখেছিলে ? দেখছো দিনকাল খারাপ একটু সাবধানে এসব কাজ করতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি—প্রশ্ন, উপদেশ, সহানুভূতির ঠেলায় চক্ষু অন্ধকার !

সত্যি মিথ্যে কিছু খোঁজ নেবার দরকার নেই—রগড় বেধেছে অতএব গড়্‌গড়্‌ ক'রে পেছনে এসে ত ধাওয়া কর।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, মনে করুন, মরে গেলেও যাঁরা কস্মিনকালেও আমার খোঁজ নিতেন না তাঁরা ট্রাম ভাড়া বাস ভাড়া ক'রে নিত্যি রাড়ী এসে আমার জেল হল কিনা খবর নিয়ে যেতে শুরু করলেন।

সেদিন এক পরমাত্মীয় এলেন এই ব্যাপার কতদূর গড়িয়েছে দেখতে। তিনি খিদিরপুর ডকে কাজ করেন,

ভীষণ খাটুনি, কারুর বাড়ীতে বৌ-ভাতের নেমন্তন্ন রাখতে যাবার সময় পর্যন্ত পান না। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ছুটি হ'তে পড়ন্ত রদ্দুরে ঘেমে নেয়ে টালায় আমার বাড়ীতে পেঁছে দেখলেন, যে আমি হাজতে না গিয়ে বসে বসে রেশন কার্ড কোন্ দোকানে রেজিস্টারি করবো তাই নিয়ে ভাবছি—এই দেখে তিনি কেঁদে ফেলেন আর কি! বলেই ফেল্লেন—তবে যে পোতার মুখে শুনলুম তোমার বছর দেড়েক ঘানি টানার অর্ডার হয়েছে! তা তুমি ত দিব্যি বসে আছ দেখছি!

আমি হাঁ না কিছু বলবার আগেই তিনি ছুটলেন ৬-৪৫ মিঃ-এর ট্রেণ ধরতে।—আঁতুল মৌরি থেকে ডেলী প্যাসেঞ্জারী করেন কিনা। কী কৃচ্ছ্র সাধন বলুন।

যদি বলেন খবরের কাগজে এর প্রতিবাদ করনা কেন? তাতে কোন কাজ হয়? কারণ লোকে কেচ্ছাটাই পড়ে, প্রতিবাদ বেরোলে পাছে মন খারাপ হয়ে যায় ভেবে সেদিন কাগজ কেনাই বন্ধ করে দেয়, কিম্বা পড়বার সময় পায় না। অতএব আমার নিরাপরাধত্ব বোঝাই কি ক'রে?

চতুর্দিকে মুশকিল! কাকে বোঝাবো যে ওরে বাপু, আজকাল শুধু ভাগ্নে ভাইপো পরিচয় দিয়ে নয়, আরও অনেক সব হয়ে বেরুতে শুরু করেছে, যাদের ওপর-থেকে দেখলে মনে হয় ভদ্দরলোক কিন্তু আসলে তারা অতি ছোট লোক আর পাজী। ধুমসো, হ্যাংচা, ভুঁটে, হুড়কোর চেয়ে এরা বজ্জাত আর জোচ্চুরির আর্টে স্মার্ট,—এইটেই আমার অভিজ্ঞতা। তোমরা দয়া ক'রে এইটে মনে রেখো!

বেয়াক্কেলে মক্কেল

জীবনে আমার পরিচিত লোকের অভাব ঘটেনি কিন্তু বরাতগুণে দেখলুম আমার চেনা লোকদের মধ্যে শতকরা আশিজন মক্কেলের আক্কেল বলে পদার্থটা নেই। এঁদের নিয়ে দুঃখের সংসারে আমার যে কিভাবে কাটে তা শুনলে আপনারা বোধহয় কোকিয়ে কেঁদে উঠবেন। আহাম্মক অনেক দেখেছেন আপনারাও, কিন্তু বেয়াক্কেলদের নিয়ে আপনারা নিশ্চয় এত ভোগেননি। আমার দুর্দৈব এই যে, এঁরা চরকির মত অবিরত আমার চারপাশে বাঁইবাঁই ক'রে ঘুরছেনই। এঁদের প্রতিজ্ঞা আমায় রাস্তায় ভাল ক'রে চলতে দেবেন না, কোথাও সামাজিকতা রাখতে দেবেন না, নীরবে পাশ কাটিয়ে এঁদের থেকে দূরে সরে থাকবো, তাও এঁরা সহ্য করতে পারবেন না।

রাস্তা দিয়ে চলেছি—ওপরের জানলা থেকে দিলেন জ্বলন্ত সিগারেটের এক টুক্‌রো মাথায় ফেলে, নয় এক ধাব্‌ড়া পানের পিচ, নয় ছেলেপুলেদের যা-হোক কিছু। সর্বাঙ্গ পবিত্র হয়ে গেল। গালাগালি দিন—ওপর থেকে তিনিই ইঁট্ মারবেন আর পাড়ার লোকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা

দেখবেন। প্রতিকার চুলোর দোরে যাক্ প্রতিবাদেরও একজন সমর্থক জুটবে না। স্বাধীন দেশের লোক, এঁদের কার্যকলাপের স্বাধীনতা খর্ব করবে কে?

শেষ পর্যন্ত হবে—যাক্‌গে মশাই, এক্‌সিডেণ্ট একটা হয়ে গেছে, তাতে অত মাথা গরম করবার কি আছে? বাড়িতে গিয়ে জামা কাপড়টা বদলে আসুন না—আপনি ত আর খুন হয়ে যাননি।

আচ্ছা, এ শুনলে মাথা ঠাণ্ডা হয় কারুর? তখন মনে হয় না যে, মাথার চুলগুলো পট্ পট্ ক'রে ছিঁড়ে ফেলে সেইখানে লোকের পায়ে মাথা খুঁড়ি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! যেহেতু সরকারী রাস্তা এবং আমার পিতৃদেব ত সেটা বাঁধিয়ে দিয়ে যাননি অতএব সব জিনিস, সব্বার ঘাড়ে ফেলবার অধিকার ত স্বতঃসিদ্ধ! কোন ভারী জিনিস ত আর পড়েনি? হাল্কা জিনিস, একটু রাস্তার কলে মাথা বাড়িয়ে ধুয়ে নিলেই ত চুকে যায়।

আচ্ছা, এইসব জ্যাঠামশাইদের আপনি কী যুক্তি দেখাবেন? মানে, যাকে বলে একেব নম্বরের মুখ্যু, এদের সঙ্গে সর্বদা মারামারি ক'রে চলবার মত রেশনও যে পাই না—অতএব চুপ ক'রে থাকাই প্রশস্ত! কিন্তু আর কত চুপ মেরে থাকবো?

ট্রামে, বাসে সিগারেট বিঁড়ি খাওয়া আইনতঃ না হলেও ভদ্রতার খাতিরে নিষিদ্ধ কিন্তু পাছে স্বাধীনতা কুঁচকে যায়

বলে বাবুরা তা খাবেনই এবং কিচ্ছু বলবার উপায় নেই। তার ফলে আমার পাঞ্জাবিটার অবস্থাটা যা দাঁড়িয়েছে তা আর চোক চেয়ে দেখা যায় না। এবার নিখিল ভারত বেয়াক্কেলে প্রদর্শনী হলে টাঙিয়ে দিয়ে আসবো—দেখবেন, সর্বত্র একেবারে বসন্তমার্কা ক'রে ছেড়ে দিয়েছে। গর্মীকালে লোকে ফুটো গেঞ্জি পরে, আমাকে ফুটো পাঞ্জাবি পরে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়। মনে করুন, রিপুর জায়গা নেই, ইয়া ইয়া সব গর্ত।

তার ওপর এসব যানবাহনে সুস্থির হয়ে যাবেন তারও উপায় নেই। ঠিক একটি পরিচিত ভদ্রলোক উঠলেন, মুখে একগাল হাসি আর তাঁর যত প্রাণের কথা, আপনার গোপন কথা সব সুরু হয়ে গেল। লোকেব দম আটকে যাচ্ছে ভীড়ে, পাশের লোককে একটু ঘাড় ফিরিয়ে যে দেখবেন তারও উপায় নেই, ট্যারা চোখে দেখে নিতে হয়, সেই

সময় বিনিয়ে বিনিয়ে তাঁর প্রশ্ন সুরু হল, তাঁকে গুষ্টির সংবাদ দিন।

এই যে বিরূপাক্ষবাবু যে, কোত্থেকে মশাই? ওঃ, সেদিন খুব একচোট নিয়েছেন, যা লিখেছেন মাইরি খুব সত্যি, সবেতেই ঝঞ্ঝাট কি বলুন? হেঁ হেঁ হেঁ করেই তারপর একচোট হাসি।

কথার জবাব হুঁ হাঁ ক'রে সেরে দিলুম, তাতেও কি রেহাই আছে?—চললো। শুনলুম, আপনি নাকি কি একটা সিনেমায় ডিরেকসান দিচ্ছেন, হ'ল না বুঝি? তা খবরের কাগজে আজকাল যে লেখাগুলো ছাপাচ্ছেন ওরা কিছু দিচ্ছে টিচ্ছে? কত দেয়? আপনার আর কিছু বই বেরুলো নাকি? হ্যাঁ ভাল কথা, শুনলুম আপনাদের বড় সাহেব নাকি কি একটা ব্যাপারে আপনার চার টাকা ফাইন ক'রে দিয়েছিল, আপনি নাকি খুব ঠুকে দিয়েছেন? বেশ করেছেন। তার-পর আপনার ছেলেটা ত ভাল ছিল শুনেছিলুম, কিন্তু সে এবার ম্যাট্রিকে গাড্ডু মারলে কেন বলুন দেখি? আর যা ইউনিভার্সিটির কাণ্ড হয়েছে, স্রেফ্ বজ্জাতি—আর কি! যাই হ'ক বড় মেয়েটাকে পাচার করতে পেরেছেন? আর সবার কি কর্চ্ছেন? অর্থাৎ, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব খবর দাও, চীৎকার ক'রে বাড়ির সাতগুষ্টির হিসেব বলতে থাক, আপিসের কেচ্ছা আওড়াও, ছেলে গাড্ডু মারলে কি লাড্ডু খেলে তার ফর্দ দিতে থাক আর ট্রামের লোক হাঁ ক'রে

তোমার চরিতামৃত পান করুক, হাঁড়ির খবর শুনতে থাকুক, তাহলেই তাঁর তৃপ্তি হয়। উঃ! মনে হয় এক একসময় গালে ঠাস্ ক'রে একটি থাপ্পড় বসিয়ে দিই, কিন্তু কাজে ক'রে উঠতে পারি না—হাজার হ'ক হিতৈষী ত! আচ্ছা, বলতে পারেন এদের আক্কেল কবে হবে?

যেখানে—সেখানে স্থান,-অস্থান কিছু নেই, এঁদের সব সংবাদ চাই। আবার এর ওপরও একদল আছেন তাঁদের সঙ্গে একবার দেখা হলে হয়। নিজে আলাপ জমিয়েও সুখ হল না আবার সঙ্গী পরিচিত কোন যাত্রী থাকলে চীৎকার ক'রে পরিচয় দিতে হবে। এঁকে চেনেন ত? এঁরই নাম অমুক ইনিই অমুক কার্য করেছেন, তমুক করেন ইত্যাদি। অর্থাৎ, ইনি প্রমাণ করতে চান যে, আমিও বড় কেউ কেটা নয়—এঁদের মত সব লোকের সঙ্গে আলাপ আছে—হুঁ হুঁ!

আচ্ছা, বুঝে বুঝে এই রকম লোকই আমার পরিচিত কেন বলতে পারেন? এ কী দুর্ভোগের ভোগ! সাধারণ সভ্যতা ভব্যতা-টুকুও জানে না, অথচ মরবার টাইম হয়ে এল? ছিঃ ছিঃ!

এঁরা আবার রসিক হলে প্রাণ যায়! এঁদের রসিকতার ঠেলাতেই রাস্তায় কলার খোসায় আছাড় খেতে হয়, কাঁচের টুকরোয় পা ফুটো হয়ে যায়, এঁরাই অজান্তে পেছনের চেয়ার টেনে অপরকে ফেলে দিয়ে রসিকতা ও বুদ্ধির চরম দেখান, মেয়েদের ভীড়ের মাঝে পেয়ে নিজেরাই

নিজেদের গা টেপাটেপি ক'রে হেসে আসর মাৎ করেন, কোন একটা ভাল জিনিস হচ্ছে অমনি পেছন থেকে বিদ্‌কুটে ফুট্ কাটেন, অপরে কথা বলছে অবিরত মাঝ পথে তাকে থামিয়ে দিয়ে ধাক্কা মেরে নিজের কথা শোনাবার জন্যে গাঁক গাঁক ক'রে চেল্লাতে থাকেন, অসুবিধে হচ্ছে কথাবার্তা বলতে, তিনি সরে গেলে ভাল হয় বুঝেও সেখান থেকে নড়েন না ঠিক দাঁত বার ক'রে বসে থাকেন, লোকে লেখা শুনতে রাজী নয় তবুও নিজের কেরামতি দেখাবার জন্যে তাকে ধরে-বেঁধে লেখা শোনাতে বসেন, যে জিনিসের কিচ্ছু জানেন না তাই করতে গিয়ে একেবারে ন্যাজে গোবরে হয়ে কেলেঙ্কারী করেন, কোথাও যাবার ঠিক ক'রে অপরকে তিথ্যির কাকের মত অপেক্ষায় রেখে অপর জায়গায় সরে পড়েন, মদ্যপান ক'রে সমাজে পাক্ মেরে মরাল্ কারেজ্ দেখান, যা নিজের নেই চাল দেখাতে তাই নালঝোল মেখে সবার কাছে খুব বড় করে জাহির করেন, বাপ খুড়োর কাঁধে মোট চাপিয়ে নিজেরা সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে পাড়ায় প্রেস্টিজ বজায় রাখেন, পরিবারের বংশবৃদ্ধির ঠেলায় এনিমিয়া ধরে গেলেও সেনসাস্ ডিপার্ট-মেণ্টের কাজ একটু হাল্কা করার চেষ্টা করেন না, নিজেদের মুরোদে এক গাড়ী ইঁট কেনবার ক্ষমতা না থাকলেও মেয়ের বাপের গলায় রসুড়ি দিয়ে তেতলায় দু'খানা ঘর তৈরীর পয়সা আদায় ক'রে নেন, দেশের সব বেটা চোর বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ট্রামের দরজার সামনে ঝুলে টিকিটের ছ'টা

পয়সা ফাঁকি দেওয়ার তালে দু'বেলা সাধুভাবে যাতায়াত করেন, অপরের রীতিমত ক্ষতি করে দেশের সবাই বজ্জাত এইটে প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগেন—অতএব এদের আক্কেল বিধানের ব্যবস্থা কিভাবে হতে পারে বলতে পারেন ?

লোকে কথায় বলে, মানুষকে বুদ্ধি দেওয়া যায় কিন্তু আক্কেল দেওয়া যায় না, এর চেয়ে খাঁটি কথা আর বোধ হয় নেই। ভাল কথা বোঝবার ক্ষমতা পর্যন্ত লোপ পেয়েছে। গাল দিলে এরা হাসে, হাসির দুটো কথা বললে ভুরু কুঁচকে রাশভারি হয়ে বসে থাকে। কোন কথার মানে এরা বোঝে না।

মশাই, আমি মরছি নিজের জ্বালায়, দুঃখের কথাই সবার কাছে নিবেদন করি কিন্তু লোকের কাছে তার মানে হয় উল্টো। সেদিন এক পরিচিত লোকের বাড়ি গেছি, তাঁদের মেয়ে মন্দ আমায় ধরে কি আব্দার জানালে জানেন ? এই যে বিরূপাক্ষবাবু এসেছেন, আপনার একটা কমিক শোনান না ?

বুঝুন ! প্রাণ ফেটে চৌ-চাক্‌লা হয়ে যাচ্ছে, আমি আর্তনাদ ক'রে মরছি আর এঁদের কাছে সেটা কমিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাহ'লে এদের ওষুধ আপনি কিভাবে দেবেন ? সেরকম ইন্‌জেক্‌শন্ বেরিয়েছে কি ? যেখানে ভাল কথা বললে ঘুলোকে মোয়, বোকার মত কথা বললে কাঁদে, গাল দিলে

বুঝতে না পেরে হাসে, খাঁটি কথা বললে কমিক কর্চ্ছে বলে—সেখানে করবেন কি ?

আসলে আক্কেল বস্তুটাই দেশ থেকে লোপ পাচ্ছে। ঘরে বাইরে কোথাও তাই শাস্তি নেই। সমস্ত অবুঝের দল, আমি সেখানে গুঁজ-গুঁজ ক'রে কি করবো ?

আমার যেসব জিনিস ব্যবহারের বা সখের, বন্ধুবান্ধবদের প্রত্যেকের তা দরকার। সতরঞ্চি, তক্তাপোষ থেকে সুরু ক'রে ছাতে ফুলের টবটি পর্যন্ত সবার প্রয়োজন। থার্মোমিটার পর্যন্ত আলমারিতে রাখবার জো নেই—পাশের বাড়ির ঘোষজা মশাই চেয়ে নিয়ে গেলেন। যেহেতু এঁরা আমার বন্ধু সেইহেতু অবিরত আমায় আক্কেল সেলামী দিয়ে দিয়ে চলতে হবে।

নিজের বাড়িতেও নিজের বলে কোন জিনিস নেই। জুতো, জামা, ছাতা, গামছা, দোয়াত, কলম, কাগজ, পেন্সিল—সব্বার দরকার—আমার ছাড়া। রেগে চীৎকার করেও আজও পর্যন্ত বাড়ির লোকের আক্কেল আমি জাগ্রত করতে পারলুম না। এমন কি পুরোনো ছেঁড়া কাপড়-গুলো পরে যে আপিস থেকে এসে একটু মাদুর বিছিয়ে নিশ্চিন্তে গড়াবো তারও জো নেই—ন' খানা কাপড় দিয়ে গিন্নী একটি মুড়ি খাবার কলায়ের ডিস্ সংগ্রহ ক'রে বসে আছেন।

বল্লুম, আচ্ছা, এই বাজারে তোমাদেরও কি একটু আক্কেল

গজালোনা—ছেঁড়া দু'খানা কাপড় পরে বাড়িতে বসে থাকতুম তাও সইলো না ?

তিনি পট্ ক'রে পট্কার পুরোনো হাফ্ প্যাণ্টটা নাকের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠলেন, এখন এইটে পরে বেড়াও না, পরে আর দুটো মোটা দেখে করিও, অনেক দিন চলবে।

আচ্ছা, বলুন দেখি বুড়ো মদ্দ—আমি এখন হাফ্ পেণ্ট্ পরে বাড়িতে বসে থাকবো ?

সত্যি স্ত্রী পর্যন্ত এই রকম বেয়াক্কেলে হলে সুস্থ শরীরে সংসার ধর্ম করা যায় ?—আপনারাই ধর্মত বুকে হাত দিয়ে বলুন !

চাক্‌রির কারিকুরি

আমার ন' ভাই নেকুর কাণ্ডটা শুনেছেন? এই দুর্মূল্যের বাজারে ভাল সওদাগরি আপিসের চাকরিটি ছেড়ে দিয়ে এসে আমার স্কন্ধে ভর করলেন। আচ্ছা এদের কি বলতে ইচ্ছে করে বলুন। বাবুর ওপরওয়ালাদের সঙ্গে নাকি বনিবনা হল না। তুই গেছিস্ চাকরি করতে সেখানে বনলো না মানে?

জিগ্যেস করতে জবাব দিলেন যে, চাকরি করতে গিয়ে ত আর আত্মসম্মানটা খেয়াতে পারি না! আচ্ছা বলুন দেখি, এগুলো শুনলে পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে যায় কি না? তুই চাকরি করবি, মাইনেটা ঠিক আনবি, ওপরওয়ালা দুশো বাজে কথা বললেও ঘাড় নেড়ে সেইটেই কাজের কথা বলে ধরে নিবি, দুটো গালমন্দ করলেও হেসে গায়ে মেখে নিবি—সেখানে আবার আত্মসম্মান কিরে বাপু! বাবুকে ছোটকর্তা কি কাজের জন্যে কৈফিয়ৎ তলব ক'রে অন্যায়ভাবে ওয়ার্নিং দিয়েছেন, তাইতেই ওঁর গোঁসা হয়ে গেল, উনি সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ ক'রে চ'লে এলেন, সঙ্গে সঙ্গে বড়বাবুর বড় শালা সেখানে ঢুকে গেল—এখন সে দিব্যি তোফা চাকরি করছে আর ইনি বাড়িতে খাটে শুয়ে কড়িকাঠগুলোর

কতখানি উইয়ে খেয়ে গেছে তাই চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে দেখছেন।

বাস্তবিক এদের মত আহাম্মক আমি পৃথিবীতে দেখিনি। চাকরি রাখা যে একটা কত বড় আর্ট ছোঁড়াগুলো কিচ্ছু শিখলে না। বাঙালীর ছেলে হয়ে এই জিনিসটার কায়দা যদি সবাই ভুলে যায় তাহ'লে ত আর কোথাও ঠাঁই হবে না। ইংরেজ আসার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর ছেলেরা অত চট্ ক'রে উন্নতি করেছিল কি ক'রে এটাও যদি আজ আমরা ভুলতে শুরু করি তাহলে দুঃখ ত অনিবার্য। আগেকার দিনে ব্যবসা-বাণিজ্য গুটিয়ে আমাদের অধিকাংশ পূর্বপুরুষরা ওদের পেছু পেছু চাকরি নিয়ে ঘুরেছিল বলেই ত সুখে ছিল—বাঁধা মাইনেতে নির্ঝঞ্ঝাটে দশ পুরুষ কাটিয়ে পেন্সন নিয়ে যা হক ক'রে সংসারটা বজায় রেখে, লাস্ট হরিনাম করতে করতে সবাই বৈকুণ্ঠে পোঁছল ত? কিন্তু তোদের একি আচরণ আমি ত বুঝি না।

চাকরি আবার আত্মসম্মান বজায় রাখা, এ কি রে বাবা। এ যে সোনার পাথর বাটী চাওয়ার মত আবদার। জগতে কোন্ চুলোয় কে চাকরি করেছে আবার বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে বলতে পার? আত্মরক্ষার জন্যেই ত চাকরি—আত্মসম্মান রক্ষে করতে চাও ত গোলদীঘিতে গিয়ে চেঁচাও, বড় বড় বুলি বল, তারপর বাড়ি ফিরে এসে এক ঘটি জল খেয়ে শুয়ে থাক, আর পাওনাদারদের বাপান্ত শোন।

তাই শুনতে হচ্ছে, তবে তাঁকে নয় আমায়। যেহেতু তিনি বাড়িতে থেকেও নেই বলে পাঠান, আর আমাকে আপিস যাবার জন্যে সকাল-বিকেল বাইরে বেরুতে হয়, সেইহেতু তারা আমাকেই যাচ্ছেতাই ক'রে আর ভাইয়ের খাতিরে নির্বিবাদে সেগুলি গলাধঃকরণ করতে হয়, সময় সময় পাঁই পাঁই ক'রে ছুটতেও হয়—তা না হলে সেসব সাধু ভাষা ত শোনাও যায় না—এই হয়েছে ফ্যাসাদ!

মশাই, আমাদের অধঃপতনের একটা মস্ত বড় কারণ কি জানেন—যে বুদ্ধিটা ক্রমশঃ একেবারে বনস্পতি ঘিয়ের সামিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বেশ ওপর-ওপর সাদা জমাট কিন্তু ভেতরে এতটুকু পদার্থ নেই! চাকরি করবো অথচ তার প্যাঁচগুলো শিখবো না এবং যারা ঘা খেয়ে শিখেছে তাদের কাছ থেকে ছুটো টিপস্ নিই—তাও নেব না—এইতেই সব বরবাদ্ হয়ে যাচ্ছে কি না!

আমি যে নিজে হাতে-কলমে ঠেকে শিখেছি, কিন্তু যখন বেশ রপ্ত হল তখন সব ভারি ভারি পোস্টগুলো ভর্তি হয়ে গেছে তাই আর কিচ্ছু হল না। আর আশ্চর্য, আমার পরে অন্ততঃ একশোজন ঢুকে পট্ পট্ করে তিনতলায় উঠে গেল, তু-চারজন আবার আমাদের বড়বাবুর ওপর টেক্কা দিয়ে একেবারে খোদ কর্তার খাস-কামরার পাশে বসে গেছে—এও দেখলুম।

সকাল থেকে আন্তরিকভাবে খেটে ছ'খানা লেজার লিখেও

যখন কূল পেতুম না, তখন দেখতুম যারা টুলের ওপর বসে থাকতো তারা আমাকে কখন ফুল্ বানিয়ে গোকুলে বাড়তে বাড়তে আর গুল্ দিতে দিতে ওপরে উঠে গেছে, আর আমি আজও জুল-জুল্ ক'রে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে হিসেবের ভুল সংশোধন ক'রে যাচ্ছি।

ভাবলুম কি ক'রে করলে?—দেখলুম সর্বাগ্রে আত্মসম্মান-টিকে তারা প্যাণ্টুলুনে পুরে পকেটস্থ করেছে। কর্তারা হাসলে হাসছে, কাশলে কাশছে, হাঁচলে দীর্ঘশ্বাস টানছে, তাঁদের আহাম্মুকি দেখলে উকি তুলছে আর দু' কস দিয়ে হাসি ঝরিয়ে বলতে শুরু করেছে, ওঃ, স্যারের কি বুদ্ধি! অনেক সময় আবার কর্তা হাসবেন কি কাঁদবেন তা ভেবে ঠিক না করতে পেরে স্রেফ্ জাম্বুবানের মত হাঁ করে রয়েছে অর্থাৎ সুবিধেমাফিক হাসিকান্না ছাড়বে আর কি। এতে কে না খুশী হয় বলুন?

মানুষ চাকর রাখে কেন, দুটো গালমন্দ দেবার জন্যেই ত? সেটা গাল বাড়িয়ে যে মেনে নেয় সেই উপকার পায়, তখন কর্তারাই তার গাল ধরে সোহাগ ভরে নীচে থেকে ঠোনা দিয়ে দিয়ে ওপরে একেবারে তালগাছে উঠিয়ে দেয়, কিন্তু যাঁরা সেখানে বুদ্ধির খেল্ দেখাতে যান তাঁদের শুদ্ধি ক'রে ভিন্ন জাতে উঠতেই হবে। এতো একেবারে ছকে বাঁধা।

চাকরি করতে গেলে বুদ্ধি, প্রতিভা, আত্মসম্মান এসব

দেখানো চলে? আরে বাপু এই সহজ কথাটা বুঝিস্ না যে, তোর মগজ থাকলে তুই গজগজ করবি এটা কোন দিগ্‌গজ্ ওপরওয়ালা জানতে পারলে পাশে ঘেঁসতে দেয়? পৃথিবীতে মানুষের কাম্য তুটি পয়সা রোজগার আর সবার ওপর মুরুব্বিয়ানা দেখিয়ে প্রমাণ করা যে, ভগবান সব বুদ্ধি থলে উজাড় ক'রে তারই মাথায় ঢেলে দিয়েছে এবং তাই এতগুলো লোক তাকে সেলাম বাজাচ্ছে। এখানে কেউ ঘা দিয়েছ কি মরেছ। অবিরত ওপরওয়ালার ভাবগতিক বুঝে চল, সঠিক রাস্তা খুঁজে পাবেই। প্রত্যেকে করছে আর তুই কে রে যে এসব করবি না?

উন্নতি করতে গেলে আবার শুধু খোসামুদিতে চলবে না তালমাফিক বড়বাবুকে আর পাঁচটা লোকের নামে লাগিয়ে-ভাঙিয়ে নিজের যোগ্যতাকে বাড়িয়ে রাখ্, তাঁর বাড়ির একটু কাজকর্মে গিয়ে দাঁড়া, বাজার দোকানটা ক'রে দিয়ে আয়. নিদেন তাঁর ছেলেপুলের জন্যে কিছু লজেঞ্চুস কিনে দিয়ে আসার ব্যবস্থা কর, পিসিমা বৃন্দাবনে মথুরায় গেছলেন তাঁর জন্যে তিনি কিছু মিষ্টি এনেছেন বলে সের তুয়েক কড়া-পাকের সন্দেশ মাঝে মাঝে দিয়ে আয়—তবে ত ভবিষ্যতে মাথায় প্রকাণ্ড টাক নিয়ে আবার কতকগুলো লোকের ওপর হাঁকডাক করে কায়দা দেখাতে পারবি। এই ত সংসারের চাকরির নিয়ম—তা নয় বাবু দেখাতে গেলেন মেজাজ, ব্যস্ একেবারে সঙ্গে সঙ্গে পড়লো বাজ। এখন সব কাজ চুলোর

দোরে গিয়ে বেলা দশটায় চৌকাঠে উবু হয়ে বসে মোটামোটা লোককে চাপকান পরে আপিসে যেতে দেখছে।

চাকরি করতে গেল জবুথুবু হয়ে, ন্যায়-অন্যায় বিচার করলে চলে না—প্যাঁচ দেখাতেই হবে নইলে ম্যাচ জমবে না, জমতে পারে না।

মনে করুন, আমাদের হেড্ অফিস থেকে খোদ বড় সাহেব সেদিন আপিস দেখতে আসবেন খবর পাঠালেন, কিন্তু আপিসের যা অবস্থা তা চোখে দেখা যায় না—সব ধড়্ধড়্ কর্চ্ছে। বেয়ারাগুলোর একটা পোশাক পর্যন্ত নেই, হেড অফিসে লিখে লিখেও দু' বছরে তার প্রতিকার হয়নি, কিন্তু সেসব ত আর সাহেব বুঝবেন না—তাঁর ইম্প্রেশন খারাপ হলেই সব লোকসান অতএব বড়বাবু আনচান ক'রে উঠলেন। আমার ওপর হুকুম হল, ওহে, এখানে যাত্রার দলের পোশাক কোথায় ভাড়া পাওয়া যায় দেখ! বেয়ারাগুলোকে তাই এনে সাজাও।

আমি ত অবাক্! বললুম, আপনি কি বলছেন? বেয়ারাগুলোকে যাত্রার পোশাক পরাব কি? তাছাড়া তার ভাড়াও ত কুড়ি-পঁচিশ টাকা নেবে।

তিনি খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, নেয় নেবে, চাঁদা ক'রে দিতে হবে সবাইকে, নইলে মেতুয়াদের মত ন্যাঙোট্ পরে সবাই ঘুরবে?

আমি বললুম, ঘুরলেই বা—সাহেব নিজের চোখে দেখে

যাক্ যে, হেড্ অফিস কি রকম গাফিলতী করে, পাঁচ বচ্ছর তাগাদা দিলেও কোন পোশাক পাঠায় না—তাহলেই আক্কেল হবে বুঝছেন না।

বড়বাবু দাঁত কড়মড় ক'রে ভেংচে বলে উঠলেন,—এমন বুদ্ধি না হলে আর তোমার এ অবস্থা হয়? তিরিশ বছর একই জায়গায় ঘস্‌টে মর্ছো সাধে? ওপরওয়ালারা বুঝি কিছু কখনও বোঝে? গোমুখ্‌খু কোথাকার—যা বলছি কর, তারপর বোঝাবো এর ফল কি হবে।

মশাই, সে এক হুজ্জুৎ! তিন ডজন যাত্রার পোশাক নিয়ে সজ্জাকররা এসে হাজির। মায় দাড়ি গোঁফ পর্যন্ত নিয়ে এসে আঠা দিয়ে দিয়ে জুড়ে বেয়ারা চাপরাশিদের সাজাতে হ'ল। মাপসই পোশাকও পাওয়া মুশকিল—তিনজন পেণ্টুলুনের খোলের মধ্যে ঢুকে গেল—কারুর ভুঁড়িটার অর্ধেক এসে চাপকান আঁটলো না—কোন-রকমে সেপ্টিপিন এঁটে, আর একটা কাপড়ের তাপ্পি দিয়ে দেহ ঢাকার ব্যবস্থা করলুম।

সাহেব এলেন। হেড্ বেয়ারা আবার তাঁকে মিলিটারি কায়দায় সেলাম জানাতে যেমনি খট্ করে পা ঠুকেছেন অমনি দেখি তার পেণ্টুলুনটির দড়ি আল্‌গা হয়ে সেটা নীচের দিকে নামতে সুরু করেছে, ভাগ্যি দোরের পাশে ছিলুম তাই রক্ষে— তখুনি আড়াল থেকে একটা ছড়ি বাড়িয়ে সেটা ঠেক্‌না দিয়ে রাখি তাই আর খসে পড়লো না—নইলে হয়েছিল আর কি!

একজনের ত গোঁফের আধ্‌খানা খুলে গেল—ভাগ্যবশে

সাহেব পেছন ফিরে ছিলেন তাই নজরে প'ড়লো না। আমি তবু চোখ টিপে বলে দিলুম, তা দেবার ভাণ করে চেপে ধর্! তাই তাতে আর এক কাণ্ড, এধারটাও খুলে গেল। যাক্ খোদ্ কর্তা সব ছিম্‌ছাম দেখে খুশী হয়ে আমাদের ওপরওয়ালা সাহেবের পিঠ চাপড়ে, ভেরি গুড্ বলে চলে গেলেন আর বড়বাবু সেই খুশীর অংশীদার

হয়ে আমার হাতে একটি চুষিকাঠি দিয়ে বলে দিলেন, বাপুহে, এইবার এইটির সদ্ব্যবহার করগে— চাক্‌রি কি ক'রে বজায় রাখতে হয় সে অভিজ্ঞতাটা অন্তত এইগুলো দেখে শিখো, তারপর সাহেবকে বলে তোমার পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব'খন

লেত্তি-লাট্টু সমাচার

বিংশ শতাব্দীর অত্যদ্ভুত সংবাদ—অভাবনীয় সংঘটন—এই নিদারুণ সময়ের দরুণ ব্যাপার! গত মাসের শেষ লগ্নে সেজবাবুর মেজমেয়ে লেত্তিটাকে কোনমতে পার করা গেছে। বলুন—এও পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের পর নবম আশ্চর্য কি না? এই বাজারে একটি মেয়ে পার করার চেয়ে গঙ্গাপারে গিয়ে চিতায় ঝাঁপ দেওয়া সহজ, কারণ যাঁরা মেয়েকে নিয়ে পার হবেন, তাঁদের অধিকাংশেরই শক্তি এক লাফে সাগর পার হবার চেয়ে বেশি, অথচ আমরা গেরস্ত লোক একটা ছোট পগার পার হতে হুমড়ি খেয়ে পড়ি, আমাদের সাধ্যি কি তাঁদের সঙ্গে তাল রাখি! তবু খানিকটা আমার বাড়ির সবাই যে এঁদের সঙ্গে কিভাবে তাল রাখলেন সেই আশ্চর্য!

ক'দিন বাড়িতে একেবারে হৈ-হৈ ব্যাপার, যত রকম উদ্ভট গোলমাল হতে পারে, তাই হল। সেজবাবু, সেজগিন্নী নিজের গিন্নী, পিসি, মাসী, ভাগ্নী, ভাইঝি, বন্ধুবান্ধব অর্থাৎ এক কথায় সমগ্র পরিবার একেবারে আমার ওপর বরাবরই খার, যেহেতু আমি প্রত্যেকবার সবার মনোমত সু-তার

কথাবার্তা কইতে পারি না। এই বিয়ের ব্যাপারে তাঁরা আমাকে একরকম বাদ দিয়েই সব ঠিকঠাক ক'রে বসলেন। আমাকে বললে নাকি বিয়ে কেঁচে যেত।

সবাই বললে, দূর, দূর, ওর কথা শুনলে লেন্তির আর কোনকালে বিয়ে হত, শেষ পর্যন্ত তাকে পাৎকোয় ঝাঁপ খেতে হত। উনি একটি কর্মনাশা বসে রয়েছেন, ওঁর কথা ছেড়ে দাও।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবুদের নাক-কান দিয়ে সর্দি ঝরলো, তবু আমার কথা আগে মিষ্টি লাগলো না। অনাসৃষ্টির সব কথা বলি বলে আমায় সবাই চুপ করে থাকবার নির্দেশ দিলেন। আমি সেই নির্দেশ মত মিচ্‌কে মেরেই একদিকে পড়েছিলুম, কিন্তু বাজার একেবারে খারাপ ক'রে দিচ্ছে দেখে বাধ্য হয়ে তু-চারটে কথা বলতে হল বৈকি!

প্রথমেই মশাই, আমি বরের বাপের দর-হাঁকা দেখে একেবারে বাঁকা হয়ে গিয়েছিলুম, এঁরা আমায় নানারকম ধোঁকা দিয়ে সোজা করলেন।

মেয়েকে পঁচিশ ভরির নীরেট সোনার গয়না দিতে হবে, এই বরপক্ষের প্রথম দাবী। বুঝলুম, একেবারে নিজে নীরেট না হলে মানুষ আজকাল লোকের অবস্থা দেখে এরকম অসভ্যের মত চায় না। এর পর দ্বিতীয় দাবী—দেড় হাজার নগদ, ঘড়ি, আংটি, সোনার একসেট বোতাম, খাট, বিছানা, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, পোর্টম্যাণ্টু ইত্যাদি, তাছাড়া

কাঁসার বাটি, থালা, গাড়ু, এতো বিয়ের অঙ্গ, অতএব সেগুলো ত দিতে হবেই। তাছাড়া কাপড়-চোপড়, খাওয়া-দাওয়া যতই কণ্ট্রোল হ'ক, গেরস্তকে খাওয়াতেই হবে, নইলে চরম স্বদেশীরাও রাত সাড়ে নয়টা খালি-পেটে বাড়ি ফিরে গেলে গালি দেবেই, অতএব সেও হাজার তিনেকের ধাক্কা—অর্থাৎ উনিশ থেকে বিশ হাজার বেকসুর খরচ, কিন্তু তা না করলে শ্বশুর নাকি ছেলের বৌ ঘরে তুলবেন না।

আমি বললুন, মেয়ে বিদেয় কর, ওঁরা একেবারে রে-রে ক'রে উঠলেন। যথাসর্বস্ব বিক্রি ক'রে, লোকের পায়ে ধরে, ধার নিয়ে জনৈক কন্যাদায়গ্রস্তের উদ্ধারের জন্যে চ্যারিটির আশ্রয় নিয়ে তবু মেয়েকে সুপাত্রে দিতে হবে। আচ্ছা, বুঝুন দেখি, এই রকম ব্যাপার দেখলে গাত্র জ্বলে যায় কি না?

সুপাত্র ত কত? কলকাতায় তিন ছটাক জমির ওপর একটি বাড়ি, তার আবার তিন সরিক—অতএব বাড়ি আছে। ছেলে-বৌয়ের ফুলশয্যের ঘর নেই। শোনা গেল, পরে তেতলায় ঘর উঠবে—সিমেণ্টের পারমিট পাওয়া যাচ্ছে না কিনা, তাই এখন শুধু আলসে তোলা রয়েছে। বাপের তিনটি ছেলে, এটি ছোট—ইতিপূর্বে এক-একটি ছেলের বিয়ে দিয়ে কর্তা এক-একটি তোলা তুলেছেন, এইটির পর পটলতোলা ছাড়া আর ওঁর বেঁচে থাকার কি দরকার হবে, তাতো বুঝি না—বেশ ত গুছিয়ে গেলেন।

এর পর পাত্রের পরিচয় শুনুন। বি, এ পাশ ক'রে পঁয়ষট্টি

টাকায় এক সওদাগরি অফিসে ঢুকেছেন। চেহারা, আমার চেয়ে আরও দু'পোঁচ কালো, বার্নিশ করা, উপরন্তু ঈষৎ টেরা। শুভদৃষ্টির সময় শুনলুম নাপ্‌তে বললে, তারই দিকে নাকি জামাইবাবু সারাক্ষণ তের্‌ছে চেয়ে রইলো।

যদি বলেন, তোমাদের মেয়েরই বা কী ছিরি! সেটা ত একশোবার সত্যি! মেয়ের ছিরি-ছাঁদ থাকলে সে কি আর এযুগে গাঁটছড়া বাঁধতো, কোন্‌কালে সিনেমা স্টুডিওর চাঁদের পাশে গিয়ে অশথ্‌-গাছের ডাল ধরে গান গাইতে শুরু করে দিত। একটু নীরেস ত আছেই। যদি বলেন, নাক নেই—আরে মশাই, বাঙালীর ঘরে অর্ধেক মেয়েরই ত ও বালাই নেই এবং বিধাতা বিলকুল ওটা উড়িয়ে দিলেই বা ক্ষতি কি? পুরুষরা অন্তত খানিকটা নাক নাড়ার হাত থেকে ত বাঁচতো। তার জন্যে নয়—এ-বাজারে টাকা থাকলে যার কিছু নেই তারও নাক-মুখ-চোখ সবই একসঙ্গে কথা কইতে থাকে—এটা বুঝছেন না?

এই ত যথাসর্বস্ব খুইয়ে সেজভায়া মেয়ের বিয়ে দিলে, কই লেত্তির নাক ত কোন ট্রাবল দিলে না? আসলে বাজারে মাল শর্ট—চাহিদা বেশি, তাই বরের বাপেরা রীতিমত

ব্ল্যাক-মার্কেট শুরু করেছে—এতে ত আর অর্ডিন্যান্স নেই। তার ওপর আমার বাড়ির মত আকাটের সংখ্যা সংসারে কম নেই, মেয়ে বড় হচ্ছে, অতএব যে কোন বখাটের হাতেও খরচাপত্তর ক'রে মেয়েকে সমর্পণ করতে হবে। এ কী!

তেমনি হচ্ছেও—মেয়েরাও বিয়ে না ক'রে অফিসে বেরুচ্ছে। বরের বাপেদের খুব রাগ—মেয়েছেলে চাকরি করছে; ছিঃ-ছিঃ হল কি ইত্যাদি বলতে শুরু করেছেন—কারণ বুঝতে ত পারছেন যে, এর পর মেয়েরা ত আর বিয়ের আগে বাজারের ভেট্‌কী মাছের মত চুপচাপ পড়ে থাকবে না যে, খদ্দের এসে তাকে পরীক্ষা ক'রে খুশি হলে তবে একটা দরদস্তুর ক'রে তুলে নিয়ে যাবে, তারা এবার কৈ মাছের মত

ঝাপটা মারতে শুরু করবে যে—তাই হয়েছে অনেকের ভয়। যাই হোক, সব টাকাকড়ির গোল মিটলো তখন আরম্ভ হল বাড়িতে গণ্ডগোল—কাপড় নাকি মাথায় চাপড় মারতে শুরু করেছে। অর্থাৎ এতদিন ধরে ওর জন্যে যেসব কাপড়-ব্লাউজ তৈরি করা হয়েছে, সে সব নাকি এযুগে কোন ভদ্রমহিলা পরেন না। যাঁরা আজ তিন বছর ধরে এসব তৈরি করেছিলেন

এবং যাঁরা ব্যবহার করবেন, তাঁরা এ বিষয়ে একমত। ফ্যাশান বদলে গেছে। অতএব মাথায় হাত রেখে সবাই কাৎ হয়ে বসে রইলেন।

আচ্ছা, একি ফ্যাসাদ বলুন ত—প্রত্যেক ছ' মাস অন্তর ফ্যাশান বদলে যাচ্ছে? অথচ আগেকার ফ্যাশান ছিল ঢের ভদ্দর লোকের মত। এই নিয়ে আমি আপত্তি করাতে আমার সঙ্গে চুলোচুলি! খেপে গিয়ে তাই বললুম, আচ্ছা, ঐ ত সব চেহারা, এতে ফ্যাশান করলে যে আরও কুচ্ছিৎ দেখায়, এটা বুঝিস না? বেশ সাধাসিদে আটপৌরেই ত ভাল—তা সেকথা কারুর ত গেরাহ্যির মধ্যে এল না, উপরন্তু গৃহিণী এসে যাচ্ছেতাই ক'রে বললেন, তুমি যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা কয়ো না, থাম। •

সত্যিই বুঝি না বাবা! মেয়েদের হাতার কাঁধের কাছে এক সময় ব্লাউজ ফুলো ছিল, এখন তা চুপ্‌সে সেখানে ফুল-ফলের পটি হয়েছে, পিঠের কাছে জোড়া ছিল, এখন তা কেটে ফিতের গেরো হয়েছে, গলা গোল ছিল, এখন তার খোল নল্‌চে পাল্টে এক কিম্ভূতকিমাকার কাট্‌ হয়েছে। সায়া পরবে তার ওপর ত দ্রৌপদীর কাপড়ের পাকের মত দশপাক ফেরতা দেওয়া থাকবে, তাতেও ময়ূরপঙ্ক্ষী পটি আর কাশ্মীরী গোলাপের ফুল বসাতে হবে। এ সব কী অনাসৃষ্টি কাণ্ড বলুন ত? অথচ লোকে সূতোর অভাবে একখানা গামছা পরতে পারছে না।

এর পর কাপড় ! উরেঃ বাবা—সে যে কত রকমের তা ধারণা নেই। ঢাকাই, শান্তিপুরী ওসব বুড়ীদের পরার ব্যবস্থা, নবীনাদের জন্যে নাকি হয়েছে আজকাল অন্যধরণের শাড়ি। ঘুড়ি শাড়ি অর্থাৎ সে শাড়ি পরলেই মনে হয় এঁরা উড়বেন, কোঁচাডুরে কাছা পাড়—মানে, দেখলে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। তার ওপর হাওয়ায়-ভাসা, ফর্দাফাঁই, পরা-কেন ইত্যাদি এত বিচিত্র ফ্যাশানের শাড়ি বেরিয়েছে যে, চক্ষুলজ্জা বশত এঁরাও পুরোপুরি ফ্যাশানেবল হয়ে উঠতে পারলেন না, ওরই মাঝামাঝি জায়গায় একটা রফা ক'রে নিলেন। যাক্, কাপড় এল প্রায় হাজার দু' টাকার ওপর।

এর পর প্রসাধন—কত রকম রং তার, সবগুলো মুখে চাপালে মনে হয় মুখ ভেঙাচ্চে।° তাই মেখে বাহার করতে হবে। তারওপর ন'খে একরকম রং, নাকে আর এক রকম—গালে এক রকম; কপালে একেবারে উল্টো রকমের—পরিশেষে চোখে আঠা মাখিয়ে ডবল পাতা।

আমি বারণ করতে কেউ ত আমায় কেয়ারই করলে না—অবশেষে বরকনের পেয়ার যখন পাশাপাশি এসে দাঁড়ালো আমি ত তাই দেখে চেয়ার থেকে উল্টে পড়ি আর কি। ভাবলুম, এ হ'ল কি রে বাবা ! একটা বিয়ে দেখলেই জীবনের চরম অভিজ্ঞতা হয়ে যায় দেখছি।

বাড়িতে সবাই বললে, খুব ভাল হয়েছে—যাকে বলে রাজযোটক কিন্তু একযোড়া ঘোটক বললেও কিছু ভুল হত

না। শুনলুম ছেলের ডাক নাম লাট্টু—সেটা আমিও তার টাট্টু ঘোড়ার মতন ঘুরপাক খাওয়া দেখে বুঝেছিলুম। যাক্, এখন লেত্তিটা যদি চালাক চতুর হয়, আর লাট্টুকে বাহান্ন-পাকে জড়িয়ে সংসারে চরকি ঘোরাতে পারে তাহ'লেই আমার গায়ের ঝালটা খানিক মেটে।

গুরু কৃপাহি কেবলম্

ওঃ! মশাই কি কুক্ষণে একবার পেট কামড়ে ছিল এবং কি কুক্ষণে যে একটি গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী বাড়ি ঢুকে পেটে গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে একবার আরাম করিয়ে দিয়েছিলেন তাই এখন ভাবি। সেই থেকে তিনি আঠার মত জুড়ে আছেন আমার সংসারে—মাঝে একেবারে গঁদ শুকিয়ে যেতে উড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, এখন বছরে তিনবার ক'রে দর্শন দেন।

নাম অনৃতানন্দ স্বামী, লোকের ভাল করেই তিনি ঘুরে বেড়ান, শিষ্যের ভীড়ে সময় সময় আমারই তাক্ লেগে যায়। আমার গৃহিণীর অগাধ বিশ্বাস তাঁর ওপর, তাঁরই ঠেলায় পড়ে আমায় মন্তর নিতে হয়েছিল এবং তার পর থেকেই দেখা গেল যে, ফুস্-মন্তরের চোটে যথাসর্বস্ব উড়ে যেতে শুরু করেছে। গুরুদেবকে বললেই বলবেন, এই করেই ত ভগবান লোকের আসক্তি কাটান, বুঝছো না?

ছোট ছেলেটা টাইফয়েডে মরমর, গিন্নী বাতে জরজর, আমি পয়সার অভাবে হরহর ক'রে মরছি, সেই সময় তিনি পায়ের ধূলো বিলুতে এলেন। কিছু সুরাহা হওয়া দূরে থাক্ তাঁর রাহা খরচ আর অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা করতে সদ্য

পঁচিশ টাকা বেরিয়ে গেল। তারপর তিনি আবার আর এক শিষ্যের ঘাড় ভাঙতে বালীগঞ্জের দিকে এগোলেন—কথায় বুঝলুম, ওদিককার কোয়ার্টারে এখন উত্তর কলকাতার চেয়ে পসার বাড়ছে বেশী—অনেক জজ, ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত শিষ্য হতে শুরু করেছেন।

বাধ্য হয়ে বললুম, তাহ'লে আমায় রেহাই দিন, আপনার ত একটা ভবিষ্যদ্বাণী আজ পর্যন্ত মিললো না, আমার আর ভক্তি শ্রদ্ধাও নেই মশাই, নেহাৎ পরিবারের খাতিরে আপনাকে কড়া কথা বলতে পারি না—অতএব আসুন!

তাঁর বয়ে যাচ্ছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণলাঞ্ছিত হাসি হেসে বলে উঠলেন, তাকি হয় যাদু? আমার কাছে যখন নাড়া বেঁধেছ, তখন তাড়া মারলেও আমি ত তোমায় হাতছাড়া করতে পারবো না, কিছু না দাও, নিদেন গোটা পাঁচেক গাড়িভাড়া বলেও দিও।

কি আপদ বুঝুন! এরকম লোক আমি দেখিনি, ধর্মের ভেক্ নিয়ে চমৎকার কারবার ফেঁদেছেন। এরকম আয়কর বিহীন প্রচুর রোজগারের ব্যবস্থা এই দেশেই সম্ভব! মিথ্যেবাদীর যাসু, একের নম্বরের ভণ্ড, যাগযজ্ঞ ও আমার মঙ্গলের জন্যে ক্রিয়া করবার অছিলায় কী টাকাটাই না মেরেছেন। তার ফলে আরও সর্বনাশ হয়েছে, নিজে দেখেছেন, তবু চক্ষুলজ্জা নেই।

স্পষ্ট বলেছি, আপনি জোচ্চোর! মিথ্যেবাদী!

প্রভু হেসে বলেছেন, এই সংসারটাই যে মিথ্যে দিয়ে গড়া, এখানে চড়া চড়া দু'-একটা কথা সবার ওপর চীৎকার ক'রে না বললে একেবারে যে রাস্তায় গড়াগড়ি খেতে হবে এটা বোঝো না? মিটিংয়ে যাও, দেখবে যত লোক সব-চেয়ে চেঁচিয়ে মিথ্যে কথা বলছে, তত তাদের খাতির বাড়ছে। কাগজ খোল, দেখবে
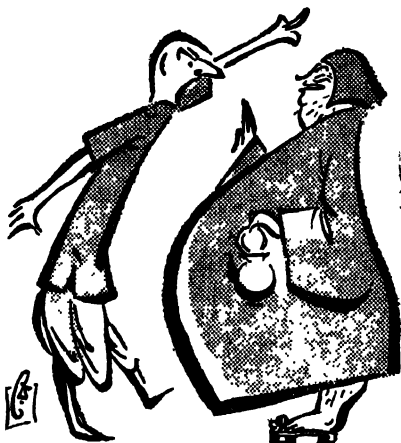
যে-লোক সব-চেয়ে চীৎকার করে নিজের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে. সেই সবচেয়ে পূজ্য। সাপ্তাহিক, মাসিক, দৈনিক যে-কোন পত্রিকায় চোখ বুলোও, দেখবে যে-সম্পাদক সব চেয়ে বেশি মিথ্যে গালিগালাজ করছে, তারই কাগজ রথতলার পাঁপর ভাজার চেয়ে বিকুচ্ছে বেশি—আপিসে যাও, যে-কর্তার সব চেয়ে গলদ সেই মিছিমিছি কেরানীদের যাচ্ছেতাই করছে এবং সেই লোকই খুব কাজের লোক বলে প্রমাণিত হচ্ছে, আদালতে যাও, যে উকীল একবর্ণ আইন না মেনে শুধু জজেদের কাছে মিথ্যে মামলা নিয়ে হামলাচ্ছে, সে শেষ পর্যন্ত হেরে গেলেও মক্কেলদের কাছে পশার জমাচ্ছে বেশি।

কলেজে দেখ, স্কুলে দেখ, থিয়েটারে দেখ, সিনেমায় দেখ, রাজনীতির বৈঠকে দেখ, যে মিথ্যে নিয়ে যত চেল্লাতে পারে তারই জয়-জয়কার। অতএব শুধু গুরুকে তাড়া করলে চলবে কেন বৎস ?

মিথ্যের জয়ধ্বনি শুনে আমি আর থাকতে পারলুম না। বলে ফেললুম, তাহ'লে আমি মিথ্যে কথা বললে ধরা পড়ে যাই কেন ?

তিনি হেসে বললেন, তার মানে এখনও পুরোপুরি তুমি আমার উপদেশ পালন করতে পারলে না যে বাবা। তবে ভেব্ড়ো না—গোড়ায় গোড়ায় নার্ভাস হয়ে পড়লে ও-রকম হয়। আমারও হ'ত—তার জন্যে বার পাঁচেক জেলও হয়েছে, কিন্তু এখন পোক্ত হয়ে উঠেছি এবং এখন আমার ভক্তের দলই লোকের রক্ত খেয়ে খেয়ে ইয়া ভুঁড়ি বাগিয়ে ফেলছে, তুমি নেহাৎ কাঁচা বলে সুবিধে ক'রে উঠতে পারছো না।

তোমার ধারণা নেই, কী পরিমাণ যে টাকা এরা সরিয়েছে, যে তার কূলকিনারা করতে ইনকামট্যাক্সের কর্তারাও পারবে না। সমাজে মান খাতির কারুর চেয়ে কম নয়, এর পরের বারের ইলেক্শনের সময় ওরাই হয়তো রাজত্ব চালাবার ভার নেবে।

এসব শুনে আমার ত চোখ কপালে ওঠবার উপক্রম হল, কিন্তু তিনি এত পূজনীয় ব্যক্তিদের নামের ফিরিস্তি দিলেন যে, তার প্রতিবাদ করবো কি, এক চালে কিস্তি মাৎ হবার উপক্রম!

বললুম, তা বলে সংসারে কেউ ভাল নয় ?

ঠিক তেমনি হেসে ঠাকুর শুরু করলেন, হ্যাঁ, থাকবে না কেন, তবে তারা চতুর্দিকের মিথ্যের চাপে চুপ্‌সে রয়েছে, তোমারই মত বেচারীদের শাঁসজল নেই—তাদের মুক্তির আশা অল্প! যখনকার যা তখনকার মত না চললেই তুমি ত প্রগতির পথে এগুলে না—সংসারে তোমার মত ব্যাক্‌-ডেটেড্‌ যারা তারা ত চিরকালই ল্যাংচাবে এবং গুরুদের গাল দেবে কি না!

আমি বললুম, কিন্তু অধর্মের টাকা ত আর বরাবর থাকে না—ও বেরিয়ে যাবেই।

তিনি বললেন, তুমিই কি এ পৃথিবীতে বরাবর থাকবে? এ পৃথিবীতে ত কিছুই থাকে না, তবে যদ্দিন আবুহোসেনি ক'রে নেওয়া যায়, এই ত ভাব সবারই।

একটু ভেবে বলে উঠলুম, তাতে সুখ কি?

গুরু বললেন, সুখ নেই যদি বুঝেছ, তাহ'লে অত বায়না বকাই বা কেন? তোমাকে কি ইচ্ছে করলে আমি কিছু পাইয়ে দিতে পারতুম না, পারতুম কিন্তু তখন আমাকেও মানতে না —শিষ্যদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি—তাই ধাত্‌ বুঝে তাদের সঙ্গে বাতচিত করি—তাই আমার এত খাতির, বুঝেছ? টাকা না-পেয়ে যে দুঃখু, টাকা পেলে আরও দুঃখু বাড়তো।

আমি বললুম, টাকা পেলে দুঃখু বাড়ে স্বীকার করি না যদি সেটা ধর্মত পাওয়া যায়!

গুরুদেব খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, ধর্ম আর টাকা এ যুগে

এক সঙ্গে আসে না—তবে যদিও বা আসে তাহ’লেও তা ডাকাতরা কিম্বা ডাক্তাররা মারে।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কি রকম?

গুরুদেব বলতে লাগলেন, আমার শিষ্য লট্‌খটিরাম যেভাবে টাকার বিছানায় শুয়ে মারা গেল, তা দেখলুম কি না! যুদ্ধের বাজারে আমার উপদেশ নিয়ে চোরাকারবার ক’রে বেশ দু’পয়সা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব বজায় রাখতে পারলে না। অতগুলো খাতায় কোন্‌টা সত্যি হিসেব আর কোন্‌টা মিথ্যে তা নিজেরই খেয়ালে থাকতো না। কতদিন বলেছি, মিথ্যেগুলোয় সিঁদুর দিয়ে দিয়ে চিহ্ন ক’রে রাখ, তা কথা শোনেনি, তেমনি ফেঁসেও গেল। সব ঘুলিয়ে মুলিয়ে একাক্কার —সেইগুলোকে ঠিক করতে ধুন্ধুবর এটর্নীই নিলে তিন লাখ, ব্যারিস্টার, উকীল, আমলারা নিলে আড়াই লাখ, বাকী নগদ যা ছিল তা নিলে কলকাতার ন’জন ডাক্তার।

ডাক্তার?—সে কী!

হ্যাঁ—তাঁরা অবশ্য ইচ্ছে ক’রে নেননি, সেটা বাড়ির লোক তাঁদের নেওয়ালে। বড়লোক, টাকার ভাবনা ভেবেই অসুখে পড়লো, আবার অসুখটা কি তা ঠিক করাতেই অর্ধেক টাকা বেরিয়ে গেল। আধ ডজন ডাক্তার বাড়িতেই ডিস্‌পেন্‌সারি খুলে ফেললেন।

প্রথম প্রথম চোখ ফুলতো আর নাক ফুলতো তার জন্যে মাসখানেক চোখের আর নাকের ডাক্তার আসতে শুরু করলেন।

তারপর সেই ফোল্বা বুকের দিকে ঝুঁকলো, এঁরা বললেন, এগুলো আমাদের এলাকার বাইরে, বুকের ডাক্তার আনো, আমরা ওপরটা সামলাচ্ছি। বুকের ডাক্তার দু'চারদিন দেখার পরই ফোলাটা পেট অধিকার করলে, তখন ইনি বললেন, এ দিকটা আমি রক্ষে কর্চ্ছি, কিন্তু ওদিকটার ব্যাপার কি হচ্ছে বুঝতে পার্চ্ছিনা, কারণ আমার তিন ইঞ্চি বর্ডার লাইনক্রস ক'রে ফুলোটা বেরিয়ে গেছে, তোমরা পেটের স্পেশালিস্টকে নিয়ে এস।

অতঃপর তাঁকে ডাকা হ'ল। তিনি দেখতে দেখতে ফুলোটা ঠ্যাংয়ে গিয়ে ঠেল মারলে, তখন আবার এঁর সীমানা ছাড়িয়েছে। ইনি বললেন, দেখুন এ বিষয়ের একজন মুরুব্বি আনুন, কারণ ঠ্যাং ধরে টানাটানি করা আমার কম্ম নয়। ঠ্যাংয়ের ডাক্তার এল, এ ছাড়া জ্বরের জন্যে একজন ও অম্বলের জন্যে আর একজন ডাক্তার ত মোতায়েন ছিলই। প্রত্যেকে যে যার জায়গা নিয়ে ঘাঁটি আগলে বসে আছে, আর প্রাণভরে পরিখা খননের মত ইঞ্জেকসান চালাচ্ছে। লট্‌খটির প্রাণ যায়!

ইতিমধ্যে, তার পিসিমার বিশ্বাস কব্‌রেজিতে, তিনি চুপিচাপি সুরুয়ার বদলে কবরেজ ডেকে এনে তাকে পাঁচন খাওয়াতে শুরু করলেন। বেচারার নাচন করার ক্ষমতা ছিল না, তাই বিছানা থেকে উঠে ধেই ধেই নাচতে পারলে না, এই যা দুঃখু! নড়ন চড়ন একেবারে রহিত।

আমি বুঝলুম ওর ত হয়েই এসেছে, পাঁচজনে ত মারছেই,

তা আমি আর বঞ্চিত থাকি কেন, বললুম, একটা যজ্ঞ করতে—হাজার পাঁচেক টাকা দাও, ঘি আর চন্দন কাঠ আনি। তাই দিলে—আমার শ' পাঁচেক গেল। ওদিকে যজ্ঞও শেষ হল, লট্‌খটিও পটল তুল্লে।

আমি, ডাক্তারবাবুরা, কবরেজ মশাই সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলুম মানুষ চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু পরমায়ু ত আর দিতে পারে না, তবে বেশ ভাল রকম চিকিৎসা ক'রে যে মারা পড়লো এইটেই আনন্দের কথা, একটা অঙ্গকেও সহজে ত ছেড়ে দেওয়া হয়নি! তবে এইবার যাতে তার শেষ কাজটা ভাল করে করিয়ে বেচারীকে ওপারে চতুর্দোলা ক'রে স্বর্গে পাঠানো যায়, তার বন্দোবস্ত কর!

সবাই মাথা নেড়ে সায় দিয়েছে, পরশু ছেরাদ্দ, একবার তাই বালীগঞ্জের দিকে এগোচ্ছি। এই ত ছুনিয়া বাবাজী।

আমার সব কথা শুনে আর বাক্যস্ফূর্তি হল না। হঠাৎ খপ্‌ করে গুরুদেবের পায়ের ধূলো নিয়ে বলে উঠলুম, গুরু, তুমিই সত্য। তোমার বুদ্ধির সিকি অংশ পেলে, কেল্লা ফতে! গুরু কৃপাহি কেবলম্‌!

আহাম্মক

আচ্ছা, পৃথিবীতে এসে কটা আহাম্মকের সম্পর্কে আপনারা এসেছেন ? নিশ্চয়ই দশ বারোটার বেশি নয়, কিন্তু আমার বরাতে একেবারে ডজনে ডজনে এসে হাজির হয়। এঁদের সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তা চরম বললেও সবটা বলা হয় না। সাধারণ জ্ঞান, বুদ্ধি, ভদ্রতা সমস্ত বিসর্জন দিয়ে চতুর্দিকে যে আমার এত স্বজন হন্‌হন্ ক'রে ঘুরছেন তা নির্জনে থেকে বুঝতে পারি নি, সম্প্রতি একটু আত্মপ্রকাশ করতেই সকলে হাড়মাস জ্বালিয়ে খাচ্ছেন।

মশাই, বাজারে থলি হাতে ঘুরছি, দর শুনে শুনেই যখন চেহারার কলি ফিরতে আরম্ভ করেছে, ঠিক সেই সময় এক আহাম্মকের সঙ্গে দেখা—আর যায় কোথা !

এই যে বিরূপাক্ষবাবু আপনিও বাজার করেন নাকি ? দেখছেন ত মশাই আপনাদের কংগ্রেস গভর্নমেণ্টের কাণ্ড, দেশের লোকদের একেবারে জ্বালিয়ে খাচ্ছে, আচ্ছা করে আসচে বারে একটু ঠুকে দেবেন ত, বরফ দেওয়া ইলিশ পাঁচ টাকায় বিক্রি করছে, ইয়ার্কি !

তাঁর চীৎকারে ও বিরূপাক্ষের নাম শুনে, তদুপরি উপদেশের ঠেলায় কৌতূহলী হয়ে পঁচিশ তিরিশজন লোক দাঁড়িয়ে গেল আমায় ঘিরে।

কেউ বললে, ও আপনারই নাম বিরূপাক্ষ নাকি? আপনিই খুব কমিক করেন না?

একজন আবার রসিকতা ক'রে আমার ছেঁড়া থলিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠলেন, ও কি মশাই, ফুটো দিয়ে ঝিঙে উঁকি মারছে যে, হেঃ, হেঃ, হেঃ। অর্থাৎ সবেতে যে তাঁর নজর আছে, তিনি যে খুব রসিক সেটা বোঝানো চাই ত? তা না হলে কারুর ঝিঙে কোন্ ফুটোয় উঁকি মারছে এসব কেউ দেখে? পয়লা নম্বরের আহাম্মক আর কি! তেমনি লোকেরও ছিরি, হো হো ক'রে এক গাল হেসে ফেললে।

যাই হ'ক ক্রমশ দেখি চতুর্দিকে এক রঙ্গে লোক দাঁড়িয়ে গেছে, যেন বাজারে এসে আমি একটা গুরুতর কাণ্ড ক'রে ফেলেছি। এরপরে দূরের লোকেরা ডিঙি মেরে মেরে আমায় দেখতে লাগলো। কত রকমের প্রশ্ন; এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক হঠাৎ দূর থেকে বলে উঠলেন, এত ভীড় কেন হে? গাঁটকাটা বুঝি? দাও না ছ'ঘা দিয়ে, সেদিন পকেট থেকে ঐ বেটাই নির্ঘাৎ আমার তিন

আনা সরিয়েছিল। বুঝলুম অবস্থা ক্রমশ গুরুতর হয়ে আসছে, কোনমতে ভীড় ঠেলে বাজার ছেড়ে পালাবার পথ পাই না। এক আহাম্মকই একেবারে আমার দফা রফা ক'রে দিলে। এখন কম্ফটরে মুখ ঢেকে প্রাতঃকালেই বাজারে ঢুকে যা পাই তাই কিনে পাঁই পাঁই ক'রে বাড়ি ফিরে আসি।

মানে, কোথায় কি বলতে হয়, আলাপ করতে হয়, তার স্থানকালপাত্র বোঝবার মত আক্কেল, দেখলুম শতকরা আশিজন ইডিয়টের নেই। ট্রামে, বাসে, পথে, সভাক্ষেত্রে এঁদের আলাপের চোটে যে-কোন সামান্য একটু পরিচিত নামী-লোকের পূর্ণপ্রলাপের অবস্থা ঘটতে পারে তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মারফৎ বুঝতে পারলুম। নিজেকে এইভাবে জাহির ক'রে প্রমাণ করার উপায় তাঁরা এইটে বের করেছেন।

এর ফলে এঁদের ছেলেপুলেরাও সেই রকম রসিকতা শিখছে। একটা চেনা লোক পেলে হয়, হয় তাকে আঙ্গুল দেখাবে নয় নিজেদের লাঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বিদিকিচ্ছিরি আওয়াজ ক'রে তাকে ভেঙাবে, আর সেখানে যদি আর পাঁচটা ইডিয়ট থাকে ত কথা নেই—হেসে ফেঁসে যাবার উপক্রম হবে।

সারা জীবন সমস্ত ক্ষেত্রে ইডিয়ট বা আহাম্মকদের ভীড়ই এখন বেশি। এক একজন আবার এক এক টাইপের। কত বলবো? এক একটি অবতার বললেও হয়।

সেদিন এক সভায় গেছি, হঠাৎ এঁর সঙ্গে দেখা। পরিচয় হতেই ধনুকের ছিলে টানার মত দু'টি ঠোঁট টেনে দন্তপংক্তি বার ক'রে তিনি শুরু করলেন, আচ্ছা মশাই, আপনার বাড়িতে প্রত্যহ এত ঘটনা হয়? এ সব সত্যি?

নাছোড়বান্দা! নাও—তাঁকে এখন বোঝাও কোন্‌টা সত্যি আর কোন্‌টা আমার বানানো?

আমি তাঁকে বললুম, মিথ্যে কথাটা কি কি বলেছি বলুন না?

তিনি সেইভাবে হাস্য গদগদ কণ্ঠে বলে উঠলেন, তা কি ক'রে বুঝবো বলুন—আমি ত আর আপনার সব খবর জানি না, তবে আমার বাড়িতেও মাঝে মাঝে ঐ রকম ঘটে কিনা—তাই জিগ্যেস করছিলুম।

আমি বললুম, মশাই, আমি কি এগজামিনের খাতা লিখছি যে আর কারুর ঘটনা কিছু টুকবোও না—যদি মিলে যায় উপায় কি! কিন্তু আপনাকে আমি বোঝাই কি ক'রে যে কোন্‌টা আসল আর কোন্‌টা নকল চীজ্‌—কারণ আপনাদের মত চীজ্‌ সংসারে গিজ্‌গিজ্‌ না করলে পাঁচজনে ক'রে খেত কি ক'রে?

দেখলুম তাঁর মত আহাম্মকের সংখ্যা পৃথিবীতে কম্‌তি নেই। সত্যি, মিথ্যে, ভাল, মন্দ, ঠিক বেঠিক কোন কিছুই বুঝতে এঁরা পারেন না—অথচ আশ্চর্য এই বাজারে এঁরাই হয়তো বড় বড় সরকারী পোস্টে বসে আছেন, কিম্বা অপরকে

ফাঁকি দিয়ে কি ভাবে টাকা রোজগার করতে হয়, তার সাত-শ' রকম উপায় বাৎলে ফেলছেন।

এঁদের আহাম্মক শিরোমণি নাম দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু ছোটখাটদের উৎপাত বড় কম নয়। আমার চারপাশে তাঁরা হরিহরছত্রের মেলা বসিয়ে প্রতিদিন হট্টগোল বাধিয়ে চলেছেন। এঁরা চলেছেন ট্রামে-বাসে, মুখে জ্বলন্ত চুরুট বা সিগারেট নিয়ে, আপনার জামা কাপড় পুড়িয়ে আগুনের ফুল্‌কি পড়লে জোর নিজ হাতে সেটিকে টুসকি মেরে ফেলে দিয়ে 'সরি' বলেই আর একটা মৌজ ক'রে টান দিলেন, তবু সেটা ফেললেন না—আপনার সামনে বসবার সীটে এক দাদা স-কাদা জুতো শুদ্ধ পা তুলে আরাম ক'রে যাচ্ছিলেন, আপনি অতি বিরক্তভাবে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে যতক্ষণ না সীটে ঠেলা মেরে বসলেন ততক্ষণ তিনি নির্বিকার ও নির্লজ্জভাবে বসেই রইলেন, নয় এসব কিছু না করেও দিব্যি হাওয়া খাওয়া বা মিঠে ঠেলা খাওয়ার লোভে ঠিক পা-দানির কাছটিতে গুটি কতক মিলে ডেলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। বললে নড়বেন না, কথা শোনালে উল্টে আপনাকে যাচ্ছেতাই করবেন।

এঁরা আমার নিত্য-সহচর। এঁরাই পরে এসে আগে যাবেন, ভালকথা বললে উল্টো বুঝবেন, কোন্‌টা হাসির কথা আর কোন্‌টা নয় তা বুঝতে না পেরে সবেতেই হে-হে ক'রে আহাম্মকী প্রকাশ করবেন, সবাই যখন স্থির হয়ে কোন্-কিছু

শুনছে তখন কুট্ করে একটি ফুট্ কাটবেন, বেশ চমৎকার একটা জায়গা সাজানো রয়েছে সেটা সব ভণ্ডুল করবেন, পৃথিবীর যাবতীয় পরিত্যক্ত বস্তু নিজের খুশীমত স্থানে অস্থানে নিক্ষেপ করবেন, আপনার মাথায় পড়লেও বয়ে গেল, বে-পাড়ায় মেনি বেরাল হয়ে থেকে নিজের পাড়ায় রয়েল বেঙ্গল টাইগার হয়ে লোকের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাহাদুরী দেখাবেন, কাজ না থাকার দরুণ পৃথিবীর কেচ্ছা রটাবেন, নিজে ছাড়া পৃথিবীর কেউ কোথাও ভাল এ ভাবতে গেলে চোঁয়া ঢেঁকুর তুলতে তুলতে মারা পড়বেন। এঁদের স্থান আহাম্মকীর তৃতীয় পর্যায়।

এবার চতুর্থ নম্বর ধরুন। এঁরা কোন্‌টা কোন্ সময় ভাল লাগে তা বুঝবেন না—এঁরা নাটক, কবিতা, গল্প, উপনিষদের ব্যাখ্যা যা-কিছু লিখেছেন তা লোকে যখন শুনতে চাইছে না, হাই তুলছে, তখনও প'ড়ে প'ড়ে শোনাবেন।

গান শুনে লোকের প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করছে তবু এঁরা ঘরোয়ানা ঘরের তানের কসরৎ না-বুঝিয়ে ছাড়বেন না, লোকে এঁদের বক্তৃতা শুনতে শুনতে পাগল হয়ে বে-জায়গায় হাততালির পর হাততালি দিয়ে অবশেষে ঘর খালি ক'রে বেরিয়ে গেল, তবু এঁরা থামবেন না, এঁদের সান্নিধ্য বা উপস্থিতি কোন জায়গায় ঠিক বাঞ্ছনীয় মনে হচ্ছে না সেটা ইঙ্গিত করলেও এঁরা বাল্‌তির হুকে আট্‌কানো কাছার মত

সেখানে লেগে থাকবেন। লোকটা এড়াতে চাচ্ছে বুঝেও ঠিক তার চারপাশে এঁরা ঘুরে বেড়াবেন।

এঁদের সঙ্গে আলাপ থাকা মহা বিপদ্‌, কারণ এঁরা অতি বিনয়ী, সদাহাস্যবদন, আপনার প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় শ্রদ্ধাসম্পন্ন। এঁদের সঙ্গে থিয়েটার, বায়োস্কোপ, খেলারমাঠ যেখানে যান না কেন আগে থেকে যা-যা ঘটবে তা আপনাকে এঁরা শুরুতেই বলে দেবেন, এঁদের ছেলেমেয়েদের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দেওয়ার জন্যে লোককে রসুড়ি দিয়ে এঁরা বাড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে দু' ঘণ্টা তাদের গান বা বাজনা বা নাচের কায়দা দেখিয়ে আনবেন, আপনি উসখুস করলেও উঠতে দেবেন না, এঁরা যে কাজ জানেন না, সেই কাজ আগে করবেন, যেটা বিশ্বাস করা উচিত নয় সেটা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ক'রে বসে থাকবেন, যেখানে সবাই ভদ্রতা করছে সেখানে এঁরা চূড়ান্ত বাঁদরামি করবেন, যে-জিনিস সবার ভাল লাগছে সেখানে নাক উঁচু ভাব দেখিয়ে মন্দ নয় বলে এঁরা চলে আসবেন, একটা জিনিসকে কুৎসিত বোঝাতে অভিধানবহির্ভূত কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ ক'রে এঁরা নিজেদের সুরুচির পরিচয় দেবেন, নিজে পুকুর চুরি ক'রে এসে অপরের ভাঁড় খুরি চুরি দেখলে ক্ষেপে থানায় গিয়ে ডায়েরি লিখিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। এঁরা আহাম্মক নম্বর চার, এইটে:আমার ধারণা।

এরপর আসুন পাঁচে। এঁদের সব বীরত্ব আর কায়দা মেয়েদের কাছে। একবার দেখা পেলে হয়—চলনে, বলনে,

চাউনিতে একেবারে বদলে গেলেন। এঁদের ধারণা এঁরা যে-সমস্ত মেয়েদের ভালবাসেন পৃথিবীতে আর তাঁদের জোড়া তৈরী হয় নি। এঁরা ভাগ্যবশে সাক্ষাৎ পেয়ে গেছেন। আর একটা ধারণা জগতের যে-কোন স্বয়ম্বর সভায় এঁদের দেখলে অবলা বালারা নির্ঘাৎ গলায় মালা ছুলিয়ে দেবেন নয় জালায় ডুবে আত্মহত্যা করবেন। এই ভেবে চেহারাকে ঘ'সে ঘ'সে এঁরা ছাল চামড়া তুলে ফেলে শুধু মেয়েদের কাছে গাল খেয়ে মরবেন তবু তালজ্ঞান ঠিক করতে পারবেন না। চিরদিন মেয়েদের খিদ্‌মদ্‌গারী করেই মলেন তবু আক্কেল পেলেন না। এঁদের আহাম্মকীব সত্যি তুলনা নেই।

এদের পরের স্তরের আহাম্মকও আছে। যথা—আমি। লোককে অভিজ্ঞতার বাণী শুনিয়ে সাবধান করতে যাচ্ছি অর্থাৎ নুনের সমুদ্রে রোজ এক মুঠো ক'রে চিনি ফেলে সেটাকে মিষ্টি করার চেষ্টা করছি, আর বুদ্ধিমানেরা হো-হো ক'রে হেসে সব উড়িয়ে দিচ্ছে—তবুও আমার আক্কেল গজাচ্ছে না, তাহ'লে আমার চেয়ে আহাম্মক আর কে আছে বলুন?

পাত্তর খোঁজা

সেজবাবুর মেজমেয়ে খুন্তিটাকে ত এই সেদিন পার করা হ'ল এখন ন'বাবুর ছোট মেয়ে লেত্তিটা বিয়ের যুগ্যি হয়ে ওঠাতে তার ব্যবস্থা করার ভার এ ভায়াও আমার ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আচ্ছা, এই বাজারে উপর্যুপরি গোটা পাঁচেক মেয়ের বিয়ে মহাপুরুষ ছাড়া কেউ দিতে পারে? বলতে গেলে, বাড়িতে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, মেয়ের সংখ্যা গোটা উনিশ—লোক শুনলে মনে করুন, ইস্ ক'রে চমকে ওঠে—তা, এঁদের একে একে স্থানান্তরে পাঠানো সোজা কথা? আর তার দরকার কি তাও ত বুঝি না।

আমি সবাইকে কতবার বলেছি, ওরে বাপু ব্যস্ত হয়ে করবি কি? যখন বিয়ের ফুল ফুটবে তখন আপনি হবে। বিয়ের ব্যাপার দেখে দেখে ঘেন্না হয়ে গেছে। পাত্তর ত নেইই উপরন্তু বহু খোঁজ নিয়েও একটা ভদ্দরলোক বেয়াই-বেয়ান পাবি না বাবা, অতএব গ্যাঁট্ হয়ে বসে থাক্। যখন আসবার আপনি আসবে। তা আমার কথার ওপর পৃথিবীর কারুর বিশ্বাস আছে? ওর কথা ছেড়ে দাও, পাগলের মত কিনা বলে, এই ত ভাব সবার।

বাড়িতে আপিস থেকে ফিরে পাঞ্জাবীটি আন্‌লায় ঝুলিয়ে

একটু নিশ্চিন্তে বসবার জো নেই। আজ কোথাও গেছলে নাকি, কিছু সন্ধান পেলে ইত্যাদি শুনতে শুনতে কান ঝালা-পালা হয়ে ওঠে। আচ্ছা, এ বাজারে কোথায় পাত্তর খুঁজবো বলুন ত? মাত্তর গুটিকতক যা পাওয়া যায় তাদের দর শুনলে তুত্তোর বিয়ের নিকুচি করেছে বলে চলে আসতে হয়, আর বাকী যা আছে তাদের চাকৃরি বাকৃরি ক'রে দিলে তবে হয়তো দয়া ক'রে জামাই মেয়েকে ঠাঁই দিতে রাজী হতে পারেন—এ অবস্থায় করি কি? বাজারে বর নেই—তাই খুঁজতে বললে গায়ে কম্প দিয়ে জ্বর আসে, আর নয় তাঁদের বাপ মায়ের দাম দেওয়া শুনলে রেগে টর্‌টর্ ক'রে বেরিয়ে আসতে হয়। কিন্তু বাড়ির লোকে ভাবেন রাস্তায় ঘাটে একেবারে বর গাদা গাদা পড়ে রয়েছে, নইলে অপর লোকেরা পাচ্ছে কি ক'রে? এদের বোঝাই কি ক'রে যে ওরে বাপু, আজকাল শুধু দাদার সংখ্যাই বেড়েছে, বরের গাদা কোথাও নেই। এক তাদের কাদা ক'রে ফেলে যদি গুছিয়ে গাছিয়ে নেওয়া যায় তবেই গতি হতে পারে নচেৎ শ্রীমতীদের কোন চান্স্ নেই।

এই সেদিন মনে করুন, একটি ভদ্রলোক এলেন মেয়ে দেখতে। পছন্দ হল, দরদস্তুর ঠিক হয়ে গেল, শেষে ঠেকলো কোথায় জানেন? আঠারোখানা নমস্কারি কাপড়ে। এই নিয়ে টানা হেঁচড়া, যাচ্ছেতাই—কাণ্ড!

শেষে আমি রেগে বলে উঠলুম, মশাই যাদের বাড়িতে

লোকে কাপড়ের অভাবে ঘরে গামছা পরে বসে আছে তাদের ওখানে আমরা মেয়ে দেব না। ব্যস্! ফেঁসে গেল।

আর একজন এলেন—ছেলে শ'খানেক টাকায় সরকারি অফিসে চাকরি করে, অতএব ছেলের চাকরি গেলেও যাতে তার পেন্সনের টাকা পর্যন্ত আমি তাঁর হাতে জমা রাখি সেই রকম চেয়ে বসলেন। অতএব তাঁকেও বিদেয় দিতে বাধ্য হলুম।

আর একজন নিপাট ভালমানুষ, মুখের দু'পাটি দাঁত সর্বদাই বেরিয়ে আছে, দুটি ঠোঁট কখনও একত্র হয় না এমনি সদানন্দ পুরুষ, তিনি কিচ্ছু চান না। তবে ঘর সাজিয়ে দেবার জন্যে ছেলের খাট, দু'টি আলমারি, একটি ড্রেসিং টেবিল, একটি সোনার ঘড়ি, দু'সেট বোতাম, পাঁচজোড়া, ভাল জুতো, এক ডজন সিল্কের পাঞ্জাবী, ফাউন্টেনপেন, ছ'টা স্যুটকেশ, তিনটি সাহেবী স্যুট, বুট ইত্যাদি ঝুটমুট বস্তু বায়নাক্কা এমন হাসতে হাসতে জানালেন যে,

সে সব দিতে গেলে অক্কা পাওয়া ছাড়া কনের বাপের গতি নেই। অতএব সেও ভক্কা হয়ে গেল।

লাস্ট—পাকা দেখা হব হব ক'রে একটা গেল ভেস্তে। ভাগ্যি সেটা আগে গেছে তাই রক্ষে তা না হ'লে চ'ক্ষে সরষে ফুল দেখতে হত। ছেলেটা বি, এ পড়তো, স্বভাব চরিত্র ভাল, বাপ মা প্রায় চোত মাসেই বিয়ে দিতে চান, এই রকম ভাব দেখালেন, খাঁই কিচ্ছু নেই কিন্তু ও মশাই, সব ঠিকঠাক হয়ে যাবার তিনদিন পরেই শুনি ছোকরা পাকাপাকি হয়ে যাওয়া দেখে লেকের জলে ঝাঁপ খেয়েছে।

কি ব্যাপার? পাশের বাড়ির দেখনহাসির সঙ্গে নাকি, তার ইতিপূর্বে ভালবাসাবাসি হয়েছিল, এঁরা অমত করাতে ছেলে রশি ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। লেত্তির সঙ্গে গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়বার আগেই সে চাট্ মেরে একেবারে ইহলোকের পাট চুকিয়ে দিলে—কিন্তু বাড়িতে আমার যা খোয়ার হল তা আর বলবার কথা নয়। আমার যা খোঁজপত্তর নেওয়ার ছিরি—ওরকম ত হবেই ইত্যাদি।

আচ্ছা, এ সব খোঁজ আমি কোথায় নেব বলতে পারেন? স্বভাব চরিত্র ভাল, কবিতা লেখেনা, কে কটা কার জন্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, মেয়ের জন্যে কোন ছেলের এজ্‌মা হয়েছে, একি এটর্নী আপিসে গিয়ে সার্চ ক'রে আসবো? বলে, নিজের বাপ-মা ছেলেপুলেদের সামলাতে পারছে না তার অমি কি করবো?

তাছাড়া, আমি যা আনবো তাও তোমাদের পছন্দ হবে না—ওঃ, ওটা একেবারে মুখ্যু—অথচ বুঝতে পারছে না যে

এরপর ওদেরই রাজত্ব হবে, কারণ কেউই—ত আর টুকে ছাড়া এগ্‌জামিনে পাশ করতে পারছে না। ও বাউণ্ডুলে, ওর ঘর দোর কোন চুলোয় নেই—বুঝছেন না যে, অবস্থা যা হয়ে আসছে তাতে পরে আমাদের সবাইকেই রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। ও মা, ও আবার একটা ছেলে, হাড়গিল্লের মত দেখতে —কিন্তু এটা বোঝে না যে, এ বাজারে গিলেকরা পাঞ্জাবী পরে বাবুরা ঘোরেন বলেই আসল জিনিসের পরিচয় পাওয়া যায় না, তা না হলে আজকালকার খাওয়ার সেঁটে কারুর আর খিল-খিলে চেহারা নেই! অমুক যক্ষ্মাকালো, তমুক পেটমোটা, ওর দাঁত উঁচু, ওর গাল তোবড়ানো, তার নাক থেবড়ানো ইত্যাদি সমালোচনা ত আছেই, তাই কোন কিনারাও হল না।

পরিশেষে মশাই, ঘরদোর আছে, ভাল চাকরি করে, স্বভাবটি গঙ্গাজলের মত পবিত্র রয়েছে, দেখেশুনে সেইরকম একটির সন্ধান আনলুম। সব ভাল, থাকবার মধ্যে সবই আছে, নেই শুধু পরিবারটি—আর নেই—সামনের গোটা এগারো কি বারোটা দাঁত—তাতে ক্ষতি কি? পাকা দেখার আগে আর দু-একটা যা নড়ছে তা উপড়ে ফেলে ভদ্রলোক দাঁত বাঁধিয়ে নেবেন কথা দিলেন, কিন্তু এঁরা তাই শুনে আমায় এই মারেন ত এই মারেন! বেরোও, বেরোও—ঘাট হয়েছে বাবা তোমায় পাত্তর খুঁজতে বলা, কোত্থেকে শেষে একটা ঘাটের মড়া নিয়ে এল গা, ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

আচ্ছা, আমার অপরাধটা কোথায় বলতে পারেন? দাঁত

উঁচু থাকলে চেঁচাবে, আবার ও বালাই ঘুচিয়ে দিয়ে যারা একেবারে প্লেন হয়ে বসে আছে, তাদের নিয়েও চলবে না—তাহ'লে আমি করি কি? না চলে নিজেদের ছ'পাটি দাঁত বার ক'রে বসে থাকো, আমার বাবা পাত্তর খোঁজার সাধ্যি নেই!

তোমাদের মেয়েগুলোই বা কি সেদিকে দেখ। না জানে, ছ'টো ইংরিজি কথা বলতে, না পারে গাইতে বাজাতে, নাচতে, ওদের হবে কি? আজকালকার বাজারে এ-সব না-জানলে কিছু হয়? যারাই জানে তাদেরই ত দেখছি হৈ-হৈ ক'রে বর জুটে যাচ্ছে।

অত কথা কি, বলে থিয়েটার বায়োস্কোপ করতে করতে কত মেয়ের ছ' তিনবার ক'রে ভাল ভাল বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আর তোমরা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে আছ, আর অপরের বিয়ের শাঁকবাজাচ্ছ! একালের ছেলেদের পছন্দ মত মেয়ে তৈরী কর—তারা এরোপ্লেন ক'রে এসে ছাদের ওপর থেকে ছোঁ মেরে মেয়ে তুলে

নিয়ে যাবে—তা নয়, রান্না আর ব্লাউজের হাতায় ফুল তোলার কারিকুরি হচ্ছে—গুষ্টির মাথা হচ্ছে—যত সব বেয়াক্কেলে কাণ্ড!

আমি কিছু পারবো না—আমার দ্বারা আর পাত্তর খোঁজা অসম্ভব! ভাবছি মেয়ে পুলিসের দল হয়েছে, ঐখানে ওদের ঢুকিয়ে দোব—পারে ত রুলের গুঁতো মেরে মেরে সব পাত্তর যোগাড় ক'রে বিয়ে করুক, তা না হলে ভালমান্‌ষির আর দিন নেই।

ছেলে মানুষ করার ছেলেমানুষী

আপনারা ত আমায় দু'বেলা যাচ্ছেতাই করেন, আমি বাড়ির ছেলেপুলেগুলোকে মানুষ করতে পারলুম না বলে।—নালিশ শুনতে শুনতে ত শরীর খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু আমি আপনাদেরই সালিশ মেনে জিজ্ঞাসা করছি যে, ব্যাদ্‌ড়ামোর ও বাঁদরামোর কী প্রতিকার আমি করতে পারি, বলতে পারেন? এ যুগে ছেলে মানুষ করতে যাওয়ার চেয়ে ছেলেমানুষি আর আছে? যুগ যখন শুধু হুজুগে পরিণত হয়, তখন নিয়মানুগভাবে কেউ কোথাও চলে দেখেছেন? এখন যে ঘোর শনির দশা চলছে জাতের, এটা বুঝতে পারছেন না?

আমার দেখে-শুনে যা অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে মন বলে, কোনমতে বাবা, জীবনের শেষ চৌকাঠটা ডিঙি মেরে বা নেংচাতে নেংচাতে পার হয়ে যাও, তারপর খোলা আকাশ পাবে, একেবারে ঘণ্টায় ছ'শো মাইল বেগে ছুট মেরো, আর পেছন দিকে পুত্র, কন্যা, ভাইপো, ভাগ্নে কারুর দিকে উঁকিটি পর্যন্ত মের না, তাহ'লেই সুখ পাবে। কারণ এরপরে যে দৃশ্যের অভিনয় হবে, সে আর চর্মচক্ষে ত দেখতে পারবেই না, আবার অদৃশ্যে থেকেও যদি চোখ গজায় ত এখানকার

কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে তা কুমোরের চাকার মত বাঁই বাঁই ক'রে ঘুরবে।

এখনই অবশ্য ঘুরতে শুরু করেছে—দুধের বাছারাই যা ক'রে বেড়াচ্ছেন, তাতে নিজেদের কাছা-কোঁচা যথাস্থানে ঠিক রেখে চলাই হয়ে পড়ছে দুঃসাধ্য ব্যাপার—পরে যে কী হবে, তা আর ভাবতেও ইচ্ছে করে না।

মশাই, মেজবাবুর নতুন ছেলে ফুচ্‌কেটার বয়েস এই বছর এগারো বারোর বেশি নয়, ফুটবল খেলা দেখার চ্যাম্পিয়ন, সমস্ত ম্যাচে যাওয়া চাই, আর সেখানে নিজের ফেভারিট দলের কেউ একটা গোল দিলে, একপাল ছোঁড়া নিয়ে অপরের খোল নল্‌চে পাল্টে দিয়ে, নেচে-কুঁদে মাঠ ছেঁচে প্রত্যহ সে বেরিয়ে আসে শুনতে পাই। আমার আপিসের ঘোষাল মশাই, প্রায়ই আমাকে বাঁদরটার কথা বলতেন, বিশ্বাস করিনি। সেদিন চুপি-চুপি টিকিট কিনে ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখে ত আমার আক্কেল-গুড়ুম হয়ে গেল! হতভাগাটা ষষ্ঠ মানে পড়ে, কিন্তু এরই মধ্যে একেবারে জাম্বুবানে পরিণত হয়ে বসে আছে! খেলা দেখবো কি ছাই, এক ঘণ্টা ধরে ওদের বাঁদরামির পালা দেখতে দেখতেই ত টাইম কাবার হয়ে গেল।

খেলা আরম্ভ হবার দু'ঘণ্টা আগে থেকে বসে কত রকম যে অঙ্গভঙ্গী করছে, তা ত চোখে দেখা যায় না, এর ওপর ফুট্‌কুনি ত আছেই। তার মাসীর বয়সী তিনজন অবলা

বালা খেলা দেখতে ঢুকলো, আর সঙ্গে সঙ্গে ওরা তাদের সম্বন্ধে এমন টিপ্পনি কাটলে যা শোনার আগে আমার কান কালা হয়ে গেলে মনে করুন, ভাল হত। ভাইপো সম্বন্ধ হলেও জ্বালার চোটে আমার মুখ দিয়েও এমন কথা বেরিয়ে গেল যে, সেটা না বলাই ছিল ভাল। আচ্ছা বলুন, এদের কি করবো? ঘরে তালা দিয়ে বন্ধ ক'রে রাখবো, না বেরাল-ছানার মত ছালায় পুরে ওগুলোকে গঙ্গার ঘোলা জলে ছেড়ে দেব?

একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওরা বেশ ফাঁক ফাঁক হয়ে বসে রয়েছে দেখে ওদের একটু সরে বসতে বলেছেন—এই তাঁর অপরাধ। আর যায় কোথায়। ফুচ্‌কেটা কণ্ঠ বিকৃত ক'রে কি বলে উঠলো জানেন? সরে বসবো কেন মশাই, আপনিই এসে আমার কোলে বসে পড়ুন না! ভদ্রলোক পালাবার পথ পান না। আর চতুর্দিক থেকে বাঁদরদের কী হাসি!

তারপর খেলা শুরু হতে সে-সব বচন কী! বাপের জন্মে কখনও শুনিনি; কিন্তু ও হতভাগারা শিখলে কোথায়? ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা কি মাইনে কম পান বলে এ সব শেখাচ্ছেন, না এরা শুকদেবের মত ভূমিষ্ঠ হয়েই সর্ববিদ্যা-বিশারদ হয়ে পড়ছে, কিছুই বুঝতে পারলুম না।

মশাই, হতভাগা ফুচ্‌কেটার পিসে-মশায়ের বয়সী একটি ছেলে ফরোয়ার্ডে খেলছে, আর উনি গ্যালারিতে বসে মুখ-ভেঙিয়ে তাকে খেলার ডিরেকশান দিতে দিতে বলছেন, এই

৮

কেস্‌টা, ওটাকে পাস ক'রে মার্ না সালা বলকে সেণ্টারে। যেন শ্রীকৃষ্ণের বড়দাদা বলরাম ওখানে বসে বসে মুরুব্বিয়ানা ফলাচ্ছেন। আচ্ছা এতে গা জ্বলে যায় কি না বলুন দেখি?

এতো তবু ভাল ভাল উদাহরণ বেছে দিলুম, কিন্তু আর যা সব বললে, সে আর বাপ দাদা খুড়োর কানে শুড়শুড়ি দেবার মত নয়। মাথায় খুন চেপে যায়। খেলা ভাঙতে পিছু নিলুম, ভাবলুম যে আজ বাড়ি গিয়ে হতভাগাকে একবার দেখবো, কিন্তু সুস্থির হয়ে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছলে তবে ত?

খেলা ভাঙতে সে ত হরেক রকমের উপদ্রব ক'রে মাঠ থেকে বাবুরা বেরুলেন। রাস্তায় মোটর আসছে ভ্রূক্ষেপ নেই, ঠিক মধ্যিখান দিয়ে চলেছে, পেছন থেকে এক ড্রাইভার

পঁক্ পঁক্ ক'রে দু'বার হর্ণ দিয়েছে, আর যায় কোথা! মার-মার মার! বেটাচ্ছেলে, মোটরে বসে রোয়াবি দেখাচ্ছ?

ড্রাইভার ত থ! নেহাৎ অহিংস ড্রাইভার ছিল তাই সামনের কাঁচটা, মোটরের হেড-লাইটটার ওপর দিয়েই ফাঁড়া কাটিয়ে নিলে, নইলে সেইখানেই মটর মাসকলাইয়ে পরিণত হত।

যদি বলেন ফুচ্‌কের একা এত সাহস? পাগল হয়েছেন? সে একা কখনও রাস্তায় চলে না, সব সময়ে দলবল নিয়ে চলেছে, গলির মোড়টিতে আসর জম্‌কে দাঁড়িয়ে আছে, নয় পাড়ার রকে বসে পৃথিবীর কোথায় কোন্ খেলায় কে কি রকম বল পাস ক'রে কায়দা দেখিয়েছিল, তা যেন একেবারে চোখে দেখে এসে বর্ণনা ক'রে যাচ্ছে।

যাক্, যে-কথা বলছিলুম, ফুচ্‌কের ইতিবৃত্ত এখনও শেষ হয়নি। এরপর বাবুরা ট্রামে উঠলেন। কনডাক্টর পয়সা চাইলে তাকে পয়সা দেওয়া চুলোয় যাক, বেঞ্চির ওপর উঠে, তার থুৎনি ধরে এমন নেড়ে দিলে যে, বেচারীর প্রাণ যায়! আজ অমুকরা ম্যাচে জিতেছে যাদু, তবু পয়সা চাচ্ছ? মাণিক রে—রে—রে—রে—

আমি আর আত্মগোপন ক'রে থাকতে পারলুম না। রেগে হ্যারিসন রোডের মোড়ে চট ক'রে হতভাগাটার কান পাক্‌ড়ে একেবারে রাস্তায় টেনে নামালুম। তখন তার কী

চীৎকার! সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার ছেলেগুলোও রা ধরলে। জ্যাঠামশাই বলে রেয়াৎ করলে না। এরপর যে কি হল, আর আমার মনে নেই!

যখন জ্ঞান হল, দেখি হাসপাতালে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে শুয়ে আছি—দু' হপ্তা পরে ছাড়া পাই। শুনলুম রাস্তার লোকে ছেলে-ধরা ভেবে আমাকে এমন ঠেঙিয়েছে যে, তার পরেই—ঐ অবস্থা! লোকের ভাবাকেও বলিহারী!

আচ্ছা, এ রকম প্রতিনিয়ত হতে থাকলে কাকে কণ্ট্রোল করবো বলুন? শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিচার, যুক্তি, ভদ্রতা, সভ্যতা যদি সমস্ত লুপ্ত হয়ে যায়, তাহ'লে সেখানে গুপ্তভাবে চোরের মত দিন যাপন করা ছাড়া আর আমাদের কোন উপায় আছে? আপনার পাড়ায় আমি মার খাচ্ছি, আমার পাড়ায় আপনি জখম হচ্ছেন। আপনারা তবু বড়লোক, পাঁচটা জানা-শোনা আছে, ব্যাক্ ক'রে বাড়ির ছেলেগুলোকে কাজে ঢুকিয়ে এ সব বজ্জাতি করার সুযোগ দিচ্ছেন না। কিন্তু দুনিয়ায় আমার হাফ্-ব্যাক হবারও যোগ্যতা না থাকার দরুণ, ওদেরই বিরুদ্ধে শুধু খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ ক'রে মরছি, কিন্তু এতটুকু ব্যবস্থাও করতে পারছি না। তার ফলে অধস্তন পুরুষ থেকে আরম্ভ ক'রে, আরও তিন থাক যাঁরা ওপরে উঠেছেন, তাঁরাও অসভ্যতা ও ইয়ার্কির সুযোগ পেলে আর ছাড়ছেন না।

সেদিন শুনলুম ভুঁটের মেজো-মেসোর এক ভাই-ঝি কোন্ এক সিনেমায় গেছলেন, তাকে ফিলিম এ্যাক্‌ট্রেস ভেবে

ছোঁড়ারা তার পাশে বসে হেসে খুশে সব ইয়ার্কির কথা বলতে শুরু করে—তার প্রতিবাদে ভুঁটে যায় রুখে, তারপর তিনটি বে-পাড়ার ছোঁড়া তার বুকে তিনটি রদ্দা ঠুকে দেয়! এরপর হৈ হৈ কাণ্ড! সিনেমা বন্ধ, মারপিট, থানা, পুলিশ ইত্যাদি। দেখুন কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ালো!

এ সব দেখে-শুনে শুধু মনে হচ্ছে, এই ত সবে কলির সন্ধ্যে, এরপর ইলেক্‌শান, দুর্গাপূজো, সরস্বতীর ভাসান কতরকম ব্যাপার আসছে, তখন দেখবেন। যদি বলেন, কোন হাঙ্গামায় যাবার দরকার নেই, বাড়িতে চুপ চাপ হাবা হয়ে বসে থাকবো বাবা, কিন্তু তাহ'লেও রেহাই নেই,—ছেলেদের থাবার মধ্যে পড়ে দাবার ছকে সবাইকে ওলট-পালট খেতেই হবে।

নাম মাহাত্ম্য

আমার এক বন্ধু সম্প্রতি খবর দিয়ে গেলেন যে, বাজারে আমার নাকি খুব দুর্নাম বেরিয়েছে অর্থাৎ বাংলা দেশের লোকেরা নাকি আমার চেয়ে কূটকচালে, পাজী, হতচ্ছাড়া, স্বার্থপর, নিরেট বজ্জাত আর কাউকে দেখেনি। লোকে যে রাস্তায় ধরে এখনও কেন ঠ্যাঙায় না এইটেই তাঁর আশ্চর্য লাগে।

বুঝলুম জীবনে একটা কাজ করেছি বটে, দুর্নাম কিনেই নামটাকে চিরস্মরণীয় ক'রে যেতে পারবো। মরে গেলেও পাঁচটা ভদ্রলোক নাম ক'রে গাল দেবে অর্থাৎ কোনমতেই চট্ ক'রে আমায় ভোলা চলবে না।

নামের চেয়ে দুর্নাম লোকের মনে বেশী ক'রে গেঁথে থাকে, অতএব আমি একেবারে সাতনরী হার হয়ে লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে দুলবো, কারুর কারুর কণ্ঠী হয়েও

থাকবো, ভেবে মনে মনে পুলকিত হয়ে, মনে করুন, সেদিন আপিসে ঘোষালকে দু'আনার রসমুণ্ডি কিনেই খাইয়ে দিলুম। পরে অবশ্য এই বাজে খরচের জন্যে একটু আফসোস হয়েছিল, কিন্তু সব সময় ত আর উচ্ছ্বাস চাপা যায় না? তাই কিছু গচ্চা গেল।

মশাই, পৃথিবীতে কটা ভাল লোকের নাম মনে থাকে বলুন! খবরের কাগজে একটা প্যারায় শোকোচ্ছ্বাস বেরোবার পরই ব্যাস সব ফরসা, কিন্তু পৃথিবীতে যত বজ্জাত লোক জন্মেছে তাদের নাম কস্মিনকালে কেউ ভুলেছে দেখেছেন? ইতিহাসের পাতায় যতগুলো ভাল ভাল লোক জন্মেছে, কোয়েশ্চেন পেপারে তাদের সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন থাকলে ছেলেরা উত্তর দিতে পারে না, পটাপট ফেল মারে, কিন্তু হাড়হাবাতেগুলোর প্রত্যেকটা নাম ও কার্যকলাপের কথা লিখতে বলুন, সবাই একেবারে ফুল মার্কস্ পেয়ে যাবে। এতে বোঝা যাচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে এসে যারা একটু ধাঁতানি না দিয়ে গেল, তারা আর কল্কেই পেলে না। অতএব বদনাম কেনা ভাল। ভাল লোক হলে আপনারা চট্ ক'রে আমার কথাটা ভুলে যেতেন, কিন্তু যেহেতু আমি বদনামী সেহেতু আমার প্রণামী অতি সহজে পাব অর্থাৎ লোকে আমায় প্রাণ ভরে গালাগালি দিয়ে হৃদয়ের অলিগলি একেবারে সাফ ক'রে যে আনন্দ পাবে তার দামটা কসে আমার মূল্য কতখানি হতে পারে সেইটে হিসেব ক'রে দেখলেই আর দুঃখুর কিছু

থাকবে না। নামের যে কী জ্বালা তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে।

প্রথমে ত নাম করা এক দুরূহ ব্যাপার। একবার ক'রে দেখুন যে, জগৎ সভায় আপনার অবস্থাটা কি হয়—সবাই যেখানে বসে আছে, সেখানে আপনি একটু উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছেন কি গেছেন। পরিচিত অপরিচিত সবাই আপনার জামা ধরে কিম্বা কনুয়ের হাতা ধরে আগে টেনে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। তাও উপেক্ষা করেন মাথায় চাঁটি লাগাবে—সেটাকেও অগ্রাহ্য ক'রে উঁচু জায়গায় উঠতে দেখলে তখন বেঁটেগুলো আপনার মাথার নাগাল না পেয়ে ছাতির গোড়াটি ধরে তার মুণ্ডিটি আপনার টাকের ওপর ঠুকে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। আর চতুর্দিক থেকে শুনবেন চীৎকার, এই বসে পড়্, বসে পড়্, খুব হয়েছে। অর্থাৎ সবাই যেখানে নিশ্চিন্তে কাত হয়ে আছে, সেখানে একজনকে ঝাঁৎ ক'রে তেড়েফুঁড়ে উঠে দাঁড়াতে দেখলে মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে সবারই।

কেন এমন হয়? তার কারণ আপনি নিজেকেই জিজ্ঞেস করুন।—তবে হয়। সবাই মিলে এক সঙ্গে রাস্তায় চলেছি, এমন সময় আপনি তডাক ক'রে টেক্কা মেরে ওপরে কারুর দোতলার বারান্দায় গিয়ে শহরের 'ভিউ' দেখবেন এ কেউ সইতে পারে না। ট্রামে গলদঘর্ম হয়ে ভীড়ের চাপে চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে চলেছি, আর আপনি ভাগ্য বশে একটা স্টপেজের

আগে উঠে বহাল তবিয়তে 'লেডিজ সিটে' বসে সিগরেট ফুঁকতে ফুঁকতে চলেছেন—এ অসহ্য। দূর থেকে একজন লেডিকে দেখতে পেলেই তাই চীৎকার ক'রে উঠি,—উঠুন মশাই, মেয়েদের সীট ওটা। আপনি আমার শত্রু না হতে পারেন, কিন্তু আপনি সহযাত্রী হয়ে অকারণে এইরকম বে-নিয়মী সৌভাগ্য ভোগ করবেন সেইটেই সইতে পারি না।

যাই হ'ক, নেহাৎ সর্ববিষয়ে যখন আপনি নাগালের বাইরেই চলে গেলেন, যখন পাঁচজনের ঠেলায় পড়ে আপনাকে নস্যাৎ করবার আর উপায় রইল না, তখন গাল দেওয়াটা হাতে থাকে এবং ঠিক তাল মাফিক সেটা যদি ছাড়তে পারা যায় তাহ'লে লোকের বাপের নাম পর্যন্ত ভুলিয়ে প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করা যেতে পারে এবং আপনাকে সেই নাম রক্ষে করতে তিনবেলা হরিনাম জপ করানোর আয়োজন করা যায়। অতএব নাম করার অভিজ্ঞতা না হওয়াই ভাল নয় কি?

একটু সুনাম হয়েছে কি জানবেন সকলের চাপে পড়ে গা দিয়ে কালঘাম ছোটবার ব্যবস্থা হচ্ছে। খারাপ লোক জানলে আপনার ত্রিসীমানার মধ্যে কেউ আসবে না, আর যদি শুনেছে আপনি নিতান্ত ভাল মানুষ, সাত চড়ে একটি কথা কন না—ব্যস্ হয়ে গেল। রোজই লোক আসছে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে, ব্ল্যাক মার্কেটে চোদ্দসের চিনি কিনে এনেও চায়ের খরচা যোগাতে যোগাতেই ফতুর

হবেন। তারপর দেখবেন নাম হওয়াতে পাড়ার বারোয়ারি পূজোয় এতদিন যেখানে ছ' টাকায় সেরেছেন সেখানে ছেলেরা ছাব্বিশ টাকা বসিয়ে রেখে বাড়িতে ধাওয়া করেছে। লোকে ঘুমুতে দেবে না, শুতে দেবে না, একটু সুস্থির হয়ে বসতে দেবে না।

মায় আত্মীয় স্বজন সব পঙ্গপালের মত বাড়িতে ঢুকতে শুরু করবে আর প্রত্যেকের মুখে এক কথা শুনবেন, ওর চাকরিটা তোমায় ক'রে দিতেই হবে, মেডিকেল কলেজে ছেলেটাকে নিচ্ছে না, তুমি একটু বলে দিলেই বুঝছো না, খবরের কাগজের সম্পাদকদের সঙ্গে তোমার ত খুব দহরম-মহরম শুনেছি, তাহ'লে এই কবিতাটা যাতে ছাপে দেখ না।

কেউ আবার এর ওপরে বলতে শুরু করবেন হয়তো, ওহে, আমার বাড়ির নলটা ভেঙে গেছে, তোমার সঙ্গে ত কত ইঞ্জিনিয়ারের আলাপ একটু বলে কয়ে দাও না, অমুককে একট. সুপারিশ কর না, তমুককে একটা ফোন করলেই ত আমার এটা সুবিধে হয়, একটু দেখ না, নিদেন এসব কিছু না পার আমাদের পাড়ায় চৌত্রিশ প্রহর হরি সংকীর্তন হবে তার প্রেসিডেন্ট হয়ে ঘণ্টা পাঁচেক বসবে চল না। যদি এই সব অনুরোধ রক্ষা না করেন তাহ'লে তাঁরা এর শোধ যা নেবেন তা কি কল্পনা করতে পারেন? অসম্ভব!

যেহেতু আপনার নাম হয়েছে সেহেতু এইভাবে সর্বদা চূণকাম করতে করতে নিজেকে সাদা না রাখেন তাহ'লেই

গেলেন—গাদা গাদা লোক আলকাৎরা হাতে নিয়ে ফুটপাতে উবু হয়ে বসে আছে। একবার সুযোগ পেলে হয়—তারপর কালো করা কাকে বলে তাঁরা ভাল ক'রে বোঝাবেন। অতএব স্রেফ চূণকাম বাবদ সর্বকাম ফতেহ ক'রে বসে থাকুন। লোকে তা না হলেই অখ্যাতি রটাবে।

আপনি গাইয়ে হয়ে নাম করেছেন, অমনি দেখবেন চ্যারিটি শো বেড়ে গেল। দাদা, তু'খানা গান গেয়ে আসতেই হবে, এ ছাড়া কাল আমার মেজ ছেলের অন্নপ্রাশনের বন্দোবস্ত করেছি, বৈঠকখানা জমাবার ভার আপনার কিন্তু।

—আমার ছোট মেয়ে পেস্তিটার বড্ড গানের সখ, তাকে হপ্তায় একদিন ক'রে বাড়িতে পাঠিয়ে দেব, তু'চারখানা রবিঠাকুরের গান শিখিয়ে দিও ভায়া।

—ফিলিমের গান একটু শেখাও ভাই!

—পরশু ছোট কাকীর সেজ বৌদির ন'ভাজের মেয়ের বিয়ে, বাসর ঘরে তোমাকে গাইবার জন্যেই ঠিক রাখা হয়েছে, যেতে হবেই তোমায়—হাঁ। এ সব ত আছেই।

মশাই, একজন নামজাদা গাইয়ে এক ভদ্রলোকের আপিসে গেছে বেলা ১০৷৷টায় কি কাজে, সেখানে বাবুরা ধরে বসলেন, মশাই, আমাদের পরম সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, একটা টপ্পা শুনিয়ে যান। বুঝুন, লোকের আক্কেল!

লেখক হয়ে নাম করেছেন, মাসিক পত্রিকা আর

সাপ্তাহিকের ঠেলায় হিক্কা উঠতে শুরু করবে। কেউ কিচ্ছু দিতে পারবেন না, শুধু আপনার মত নামী লোকের একটা লেখা বিনা 'মানি'তে চাইই—নতুন কাগজ, আপাততঃ পয়সা দিতে পারবে না—পরে কাগজ দাঁড়ালে দেবে। লেখা না দেন, হাতে কাগজ আছে, আপনার এমন গুণগান শুরু করবেন যে, জান বাঁচানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। অতএব স্বনামে ধন্য হতে চান ত লেখা বিতরণ করুন—শনিগ্রহের মত সম্পাদকরা সর্বদাই ঘুরবেন আপনার পেছনে, ভাবনা নেই।

ডাক্তার হয়ে নাম ক'রে বসেছেন, তাহ'লেই হয়েছে—আত্মীয় স্বজনের রোগ বেড়ে গেল। ভারী রোগের কথা ছেড়ে দিন, একটু পেট কামড়ালে কিম্বা চোঁয়া ঢেঁকুর উঠলে আপনার কল এসে গেল। যদি না যান আপনার সঙ্গে জলচল বন্ধ হয়ে গেল।

ডিরেক্টর হয়েছেন সিনেমার কি থিয়েটারের—ব্যস, যার সঙ্গেই দেখা হয়, দেখলেন সেই এ্যাক্টো ক'রে যাচ্ছে—একটা পার্ট দিতেই হবে, নইলে আপনাকে শ্রীপাট নবদ্বীপে যাওয়াবার আয়োজন ক'রে দেবেন সবাই।

রাজনীতি ক'রে দেশের সবাইয়ের দুঃখ ঘোচাবেন বলেছিলেন, যেমনি নাম হল, তখনই দেখলেন শুধু নিজের গুষ্টিবর্গকেই চাকরি বাকরি কণ্ট্রাক্ট সব দিয়ে ফেলার পর আর দেশের লোকের জন্যে কিছু বাকী পড়ে নেই। নিন নাম করুন!

মশাই, নামের অনেক জ্বালা। নিশ্চিন্তে কিছু করবার জো নেই, রাস্তায় বেরোবার জো নেই, ট্রামে বাসে দাঁড়িয়ে যাবার উপায় নেই—সবাই ড্যাব্ ড্যাব্ ক'রে চেয়ে আছে, হাসছে, টিপ্পনী কাটছে, গা টেপাটিপি কচ্ছে, ছোট ছেলেরা নাম ধরে ডেকে কাছা ধরে ইয়ার্কি মারবার তালে ঘুরছে, সে এক আপদ! আপনি বিশ্বের সবাইয়ের অতি আপনার লোক কিনা।

তাই কোন সামান্য নামজাদা ভদ্রলোকেরও সুস্থির হয়ে থাকবার জো নেই। আপনি কি খাচ্ছেন, কি পরছেন, কবার বিছানায় পাশ ফিরছেন তা সমস্ত টুকে নেবার জন্যে খবরের কাগজের নিজস্ব প্রতিনিধিরা একেবারে খাতা কলম নিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। পেট নাবালে পাঁচবার বাইরে যাবার জো নেই—সেখানেও ভীড় জমে আছে—তারা আবার উঁকি মেরে দেখে।

অত কথা বলছেন কি, ছিটে ফোঁটা একটু নাম হলে প্রেম করারও উপায় নেই—অমনি হৈ হৈ পড়ে যাবে। মশাই, দুঃখের কথা বলবো কি, যৌবনে একটি খেঁদীর প্রতি (বললে পাপ ক্ষয় হয় তাই আজ বলছি) কি রকম একটু ভাব জেগেছিল—চারি চক্ষুর মিলন ত গোপনে হতই, তা ছাড়া খেঁদু দু'চারবার আড়ালে আমায় জিব বার ক'রে ভেংচুও কেটেছিল। সর্বাঙ্গে যখন বেশ পুলক জাগছে ঠিক সেই সময় মরণ আমার, এক হরতালের নেতা হয়ে বসলুম—ছোঁড়াগুলো

আমায় রিক্সা ক'রে ঘুরিয়ে বেশ একটু গাঁয়ে যেই নাম করিয়ে

দিলে অমনি সব ঘুরে গেল। খাঁদুমণি পরদিনই সকলের সঙ্গে এসে আমায় একেবারে জ্যাঠামশাই বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে বসলো। প্রাণ যায়—প্রেমের দিকে আর যায় না, আমার দিকে ফিরেও চায় না—লোককে বলে বেড়ায় সে নাকি আমাকে ভয়ানক ভক্তি শ্রদ্ধা করে। বুঝলুম বরাত খারাপ! মেয়েটা যখন শ্রদ্ধা ভক্তি জানাতে শুরু করেছে তখনই বুঝেছি আর আমাকে পছন্দ নয় আর কি! একেবারে পিত্তি জ্বলে গেল—নামে অরুচি ধরালে!

নাম ক'রে ভবপারেও নিশ্চিন্তে যাবার জো নেই, জানবেন। একটি নামজাদা লোককে দেখেছি, রোগের যন্ত্রণায় থুম হয়ে পড়ে আছে, আর একশটা ডাক্তার তাঁর নড়া ধরে, ঠ্যাং চেপে বড় বড় ইঞ্জেকশান দিয়ে যাচ্ছে। এর ওপর দুশো পরিচিত লোক এসে আয়িত্তি জানাচ্ছেন। এসে দাঁড়িয়ে থাক্—তা নয়, একবার ক'রে চোখের পাতা টেনে টেনে তুলে

ধরে চীৎকার, চিনতে পার্চ্ছ? বল দেখি আমি কে? এই রকম বলাতে বলাতে সে লোকটিকে একেবারে চিরকালের মত চোখ বোজাতে বাধ্য করালে।

অতএব নামে আর দরকার নেই, এখন বদনাম নিয়ে রাম রাম করতে করতে আপনাদের এই পৃথিবী থেকে পালাতে পারি—তবেই বাঁচি।

মত ও গৎ
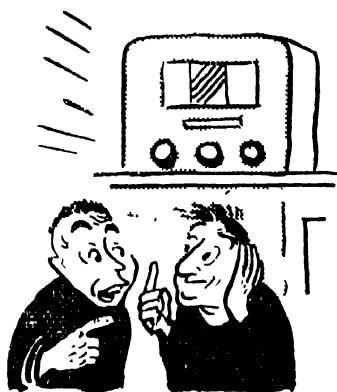
জীবনে আমার একটি খুব বড় অভিজ্ঞতা হয়েছে এই যে, কারুর মত শুনে চলতে নেই—কারণ দেখলুম কিনা, পৃথিবীতে মত বলে বালাইটাই কারুর নেই, যে যার সুবিধে অনুসারে সেটা তৈরী ক'রে নিচ্ছে। অথচ আমি নিজের মতানুসারে কাজ করতে গেলেই, একগুঁয়ে, স্বার্থপর, নিজের মতেই সর্বদা চলি বলেই ত এই রকম ঠোক্ খেয়ে মরি—সবাই বলে থাকেন। কিন্তু কি করি বলতে পারেন ? কার মতটা মানবো ? আমি ত দেখেছি যে সংসারে গলার জোরে কিম্বা লাউডস্পীকার নিয়ে যে যত চেল্লাতে পারে তারই মত লোকে মেনে নেয়, কিন্তু আমার চতুষ্পার্শে আবার তারও কম্পিটিশন শুরু হয়ে গেছে, আমি তাহ'লে কার মত মানি ?

হিট্লার একটা খুব খাঁটি কথা বলেছিলেন যে, যে-কোনো মিথ্যে জিনিস নিয়ে দশ হাজার লোকের কানের কাছে সত্যি বলে চেঁচাও অমনি সেটা খাঁটি বলে লোকে মেনে নেবে এবং কেউ তার প্রতিবাদ করতে গেলে লোকে মাথায় চাঁটি বসাবে। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের জোরে মিথ্যেকেও সত্যি করা যায়, এইছিল তাঁর বক্তব্য। কথাটা খুবই সত্যি—অবশ্য আমাদের দেশে কারুর কেচ্ছা গাইতে গেলে দশ হাজার বারও দরকার নেই,

বার দশেক চেঁচালেই চলবে—লোকে তাই সত্যি বলে বিশ্বাস ক'রে বসে আছে। আর প্রবাদ ত মুখস্থ—যা রটে তার কিছু ত সত্যি বটে। অতএব মুহূর্তের মধ্যে মত তৈরী হয়ে গেল।

আমাদের পাড়ায় সেদিন দেখি একটা লোককে সবাই ঠেঙাচ্ছে, ব্যাপার কি? না, শুনলুম লোকটা নাকি চুরি করতে এসেছিল। কোথায়, কার বাড়ীতে সে-সব ঘটলো কিছুই জানবার দরকার হল না, যে যে-ভাবে পারলে ঠেঙাতে লাগলো, লোকটা মাটীতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো, এই সময় পরমসাধ্ আমার ভৃত্য লালধারি রেশন আনছিল, সেও মনে করুন, ভীড়ের মধ্যে ঢুকতে না পেরে ধামাটি এক জায়গায় রেখে লোকের ঠ্যাংয়ের ফাঁকে ফাঁকে কায়দা ক'রে পা ঢুকিয়ে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ ক'রে তিনটে লাথি মেরে এল। পরে শোনা গেল, সে লোকটা চোরও নয় বদমায়েসও নয়, বিদেশ থেকে এসে বেচারী তার মাসতুতো ভায়ের ঠিকানা খুঁজে খুঁজে একটা ভুল নম্বরে পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে ঢুকে পড়েছিল, তার ফলে—এই দুর্গতি! বুঝুন, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। একটি লোক চোর বলে চেঁচালে, অমনি মার্ বেটাকে। ওদিকে যে চেঁচাল সে হয়ত নিজে পুকুর চুরি ক'রে বসে আছে।

ঐ যে বললুম, মাথা যে কারুর সাফ নয়, এই ত দুঃখু। আবার এইসব মাথা থেকে যে-সব মতবাদ বেরোয় তা শুনলে

পৃথিবী থেকে বরবাদ হয়ে যাবার যোগাড় হয় সময় সময়। তার ওপর মতেরও ঠিক ঠিকানা নেই। আমাদের পাড়ার মুখুজ্যে মশাইকেই দেখুন না, সকালের মতের সঙ্গে তুপুরের, তুপুরের মতের সঙ্গে সন্ধ্যেবেলার মতের মিল খুঁজে পাবেন না।

সকালবেলা উঠেই তিনি আমার বাড়ীতে এক গেলাস চায়ের অর্ডার দিয়েই শুরু করবেন যে, স্বদেশীওয়ালারা লোক ভাল নয়, শুধু তারা পরের ঘাড় ভাঙবার তালে ঘুরছে, অতি

অপদার্থ, এরা না গেলে আর দেশের অবস্থা ফিরবে না। তাঁর সঙ্গে অন্তত আধ ডজন ব্যক্তি সায় দিয়ে বলে উঠলো, যা বলেছেন, ওদের না তাড়ালে আর সুখ নেই। গেরস্থকে চাপ দিয়ে দিয়ে একেবারে মেরে ফেললে, বলেই আমার ওখানে হাফ্ কাপ ক'রে চায়ের অর্ডার হয়ে গেল। এঁদের প্রাত্যহিক চায়ের ঠেলায় আমার চোয়াল ফাঁক হয়ে গিয়ে হাঁ বেড়ে

যাচ্ছে সেদিকে হুঁশ নেই—ওঁরা গেরস্থ সামলাচ্ছেন। আবার চিনি কম পড়লে চেঁচান, এঃ, কি করেছ হে, একেবারে যে স্থক্তো।

যাক্, স্বদেশীদের মুণ্ডপাত হল সকালে—সে আলোচনা শুনলে মনে হবে যেন স্বদেশী বলে একটা আলাদা জাত ফুড়ুক্ ক'রে কোন্ ফাঁকে এক সময় এদেশে ঢুকে পড়েছে, এখন না তাড়ালে আর শান্তি নেই। তারপর সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে এসেই শুনলুম যে, মুখুজ্যে মশায়ের মেজছেলে পাট্‌কেলটাকে পুলিশ এসে কোন্ এক দলের পাণ্ডা হিসেবে নাকি ধরে নিয়ে গেছে আর মুখুজ্যে মশাই ক্ষেপে গিয়ে সেই দলের পিতৃশ্রাদ্ধ শুরু করেছেন। শুধু তাই নয়, ওঁরই প্ররোচনায় পাড়ার সাতাশটি ছেলে অফিসে ধর্মঘট ক'রে এখন বেকার হয়ে বেড়াচ্ছে—উনি তাদের বিরুদ্ধেও থানায় গিয়ে চুপি চুপি এজাহার দিয়ে এলেন আর আমাকে ও পাঁচজনকে বলে বেড়াতে লাগলেন যে দেশটার সর্বনাশ যদি কেউ করে ত এই হতভাগারাই করবে। স্বদেশী গভর্নমেণ্টের উচিত, পাড়াকে পাড়া হাজতে পোরা।

তু'দিন পরে ছেলেটা মুচলেখা দিয়ে বাড়ী ফিরে আসতে মুখুজ্যে মশায়ের মুখে আর পলিটিক্সের কথা নেই, এখন একেবারে শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত গীতার আলোচনা আর সিনেমার খবর তাঁর মুখে মুখে ফিরছে এবং শেষোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে এত মত প্রকাশ করছেন যে, সেই মতানুসারে যে

ক'খানা ছবি দেখে এলুম তার প্রত্যেকটায় স্রেফ গচ্ছা দিয়ে আসতে হল, এত বাজে! তাহ'লে বুঝুন মতের মূল্য কতখানি।

আমি ত আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলুম না কার মতে চলবো। আমি নিজে লোকটা ভাল কি মন্দ তাই লোকের মত শুনে ঠিক ক'রে উঠতে পারি না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একদল বলছে, আহা, এমন লোক আর হয়না, সংসারের জন্যেই খেটে খেটে মরছে, আর সংসারের লোকদের মত হচ্ছে আমার মত কুঁড়ে, অলবড্ডে লোক তাঁরা নাকি কখনও দেখেননি।

আমি বাজার থেকে যা আনবো তা সবই খারাপ, দামে বেশি, ওজনে কম আর তাঁরা নিজেরা সেই জিনিসই হয়তো তারকেশ্বর বা কালীঘাট থেকে ডবল দাম দিয়ে কিনে নিয়ে এলেন, সেটা তারচেয়ে সস্তা না হলেও জিনিস আলাদা,—এমনটি আর হয় না। তাহ'লে কি করবো বলুন?

আমি পট্‌কার জন্যে হাফ্‌ প্যাণ্ট নিয়ে এলে সে বলে, লম্বা প্যাণ্ট বা পায়জামা না পরে বেরুলে আজকাল ছেলেদের সমাজে ঠাঁই নেই, রাস্তায় চলা যায় না।

মেয়েদের জন্যে কাঁচের চুড়ি কিনে আনলে সেগুলো নাকি দু'দিনেই পট্‌পট্‌ ক'রে ভেঙে যায়—আমি কিনে আনি কিনা!

গিন্নির জন্যে শাড়ী আনলে তার পাড় দেখে তিনি ক্ষেপে দাঁড়কাকের মত ঠোকরাতে আসেন।

সাধ্যমত যোগাড় যাগাড় ক'রে বেয়াই বাড়ী তত্ত্ব পাঠালে তাঁদের গুষ্টিবর্গ আমাদের ঝি-এর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করেন, হ্যাগা, তোমাদের কর্তার নয় চোক নেই, কিন্তু চোকের গর্ত দুটোও কি বুজে গেছে? এই জিনিস কেউ জামাইকে দেয়?

আবার যদি যথাসর্বস্ব খরচ ক'রে হুণ্ডি কেটে লোককে কিছু দিই থুই, কি পেট পুরে খাওয়াই, তাহ'লেও লোকে বলবে, দেখ, বেটা উপরি দু-পয়সা বেশ করেছে, তা না হলে এত দরাজ হাত হল কি ক'রে? এমনি, জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রে লোকের মতের সঙ্গে আর নিজেকে মেলাতে পারলুম না।

আপনি যাই হন, সব লোকের মতানুসারে চললে এক পাও চলতে পারবেন না—অথচ নিজের মতেই বা চলবার উপায় কি? অবিরত শুধু ঘাড় নেড়ে নেড়ে মাথাব্যথা হয়ে যাক্, যে যা বলছে, হ্যাঁ তোমারটাই ভাল, এইটেই ঠিক বলতে পারেন, তবে এ সংসারে রাত্তিরে খাওয়া দাওয়া ক'রে একটু আড় হতে পারবেন, তা না হলে ঠায় সারারাত আল্‌সেতে বসে থাকুন। একি নিদারুণ অবস্থা একবার ভেবে দেখুন। তাছাড়া মত ত ঘনঘন বদলাচ্ছে।

সেদিন এক চায়ের দোকানে ঢুকে শুধু শুধু গোলমাল করাটা কি ভাল, বলে মত প্রকাশ করতে গিয়ে মার খেতে খেতে বেঁচে গেলুম। সবাই হাঁ-হাঁ ক'রে তেড়ে এলেন এবং

বিপ্লবের সমর্থনে এমন হাত পা নাড়লেন যে চারটে কাপ ডিস্ ভেঙে মাটীতে গড়াগড়ি। ঠিক তার তিনদিন পরেই সেখানে বিপ্লবের জিন্দাবাদ গাইতে গিয়ে বিপত্তি হয়ে বসে রইলো—লোকে গায়ে গরম চা-ই ঢেলে দেয় আর কি! বুঝলুম, মত বদলেছে এবং তিনদিন আগে যে মত ছিল এখন তা একেবারে পাল্টে গেছে। এতেই বুঝছি যে মত বলে জিনিসটার বালাই কারুরই নেই—সবাই গোড়ে গোড় দিচ্ছে এবং যে জোর দিয়ে কথা বলছে সবাই তাকেই দেবতা ভেবে গড়্ করতে শুরু করেছে।

আসলে বুদ্ধি কারুর নেই বা থাকলেও কুঁড়েমী ক'রে তা খাটাবে না। অবশ্য সবাই নয়—সাধারণের মধ্যে শতকরা অষ্টনব্বই জনই এই। যুদ্ধ, দাঙ্গা ক'রে ক'রে আর খবরের কাগজে লোমহর্ষক সংবাদ শুনে শুনে সব্বার মাথা গেছে বিগড়ে, তাই সর্বদা একটা উত্তেজনা চাই-ই, সে মাথামুণ্ডু যাই হ'ক না কেন। খবরের কাগজে যদি সাধারণ খবর কিছু বেরুলো, অমনি সবার মত শুনুন—দূর-দূর কাগজগুলোয় আর কোন খবর নেই—শুধু ফাঁকি আর ফাঁকি।

সাহিত্য বা গভীর দর্শন সম্বন্ধে কেউ একটি বেশ ভাল ক'রে বক্তৃতা দিক, অমনি শুনবেন, দূর-দূর কি ভ্যাজর ভ্যাজর করে। কিন্তু পাগলের মত কাছাটাছা খুলে একজন মিটিং-এ পরিত্রাহী চীৎকার ক'রে শুধু ধ্বংসের জয়গান করুক, অমনি শুনবেন, ওঃ, লোকটাকে দেখেছ, একেবারে

'ফায়ার ব্র্যাণ্ড্'—বক্তৃতার চোটে চেয়ার ফেয়ার ভেঙে একেক্কার ক'রে ফেললে। ওযা কথাগুলো বলছে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। এ মতকে বদলাতে চান ত কাছাকোঁচা সবই খুলে ফেলুন।

বেশ ভাল একটি নাটক শান্ত ভাবে অভিনীত হক, সবাই বলে বসে আছে, রাবিশ্! কিন্তু হিরো তিনবার ডিগ্বাজি খেয়ে হিরোয়িনের নাকের আধ্কেটা খাবলে নিয়ে স্টেজময় ছুটোছুটি ক'রে বেড়াক, তখুনি দেখবেন সবাই বলতে শুরু করেছে, একেবারে কুলপী বরফেব মত প্লে জমে গেছে। আবার সবচেয়ে আশ্চর্য সেই সব লোকই যেই দেখলে কাগজে তার বিরুদ্ধে একটু ফুট কেটেছে, অমনি তারাই আবার তার ওপর ফুটনোট বসিয়ে এমন কেচ্ছা শুরু ক'রে দেবে যে, নাটকের চটক জন্মের মত হয়ে গেল আর কি। নিন্ বুঝুন, কোন মতটা ঠিক।

তাই বলছি, নিজের মত অধিকাংশের নেই—আওয়াজ ও

বিজ্ঞাপনের জোর লাগান ব্যস্, সবাই আপনার দলে। কখনও স্বীকার করবেন না যে, আমি কাজটা খারাপ করেছি, কেবল বুক চিতিয়ে আস্ফালন করুন্, হাম্ যো করতা হ্যয় ওহি ঠিক হ্যয়—অমনি দেখবেন সবাই থতমত খেয়ে গিয়ে কোরাসে মাথা নাড়তে নাড়তে বলছে, হাঁ, হাঁ উওতো বিল্কুল ঠিকই হ্যয়!

অনেক দেখে এই অভিজ্ঞতাটুকু অর্জন করেছি এবং পলিসি হিসেবে এই পদ্ধতি চালিয়ে দেখেছি যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়। সেদিন মনে করুন, বাজারে ডাহা ঠকে একটা রসা মাছ কিনে নিয়ে বাড়ি ঢুকেই চেঁচাতে শুরু করলুম যে, সবচেয়ে সেরা জিনিস, সবচেয়ে সস্তায় আজ কিনে এনেছি, এতে খুব বেশি করে পাঁ্যাজ,আদাবাটা, লঙ্কা দিয়ে ঝাল রাঁধ, অম্বল কর, রোস্ট বানাও, গরম মসলা দাও, খেয়ে দেখো কি জিনিস, ইত্যাদি ক'রে এমন গোলমাল হৈ-চৈ, মাছের বর্ণনা, কিভাবে সকলের লোলুপ দৃষ্টির সামনে দিয়ে সেটাকে নিয়ে এসেছি, বলে জাহির করতে শুরু করলুম যে, বাড়িতে গিন্নিকেও বলতে হল যে না জিনিসটা পুকুরের থেকে সদ্য ধরাই বটে—সেদ্ধ হতে তিন মিনিটের বেশি লাগলো না।

কিন্তু পরের দিনেই মেজবাবুর সেজছেলে ন্যাবলা আর ন-বাবুর নতুন মেয়ে গেবলিটার পেট ছেড়ে দিলে—সেটাকে সামলাতে আবার ডবল চীৎকার শুরু করে দিলুম, ঐ জন্যে ভাল জিনিস আনি না, যা পাবে তাই আদেখলের মত খাবে,

ওজন বুঝে খাবে না, তাই যত ঝামেলা—সংসারে ঘেন্না ধরে গেল ইত্যাদি। স্রেফ্ চীৎকারের চোটে সবার মত পাল্টে গেল এবং আমার সুরের ঝঙ্কারে মাথা নেড়ে সবাই অল্পবিস্তর সুর মেলালেন।

অতএব দাদু—সৎ বস্তু বলে এ যুগে কোন জিনিস চালাতে গেলে যুক্তি, বিচারশক্তি কোন-কিছু প্রয়োগ করতে যাবেন না, কেউ মত প্রকাশ করার আগে নিজের মতটা জোর ক'রে চালাতে থাকুন, দেখবেন আপনার গতের সঙ্গে সবার নাক আর নথ কেমন তাল দিতে দিতে নড়ছে।

ভ্যারাইটি শো

আমার যন্ত্রণা কি একটা? একশো একষট্টি রকমের বাড়ির, তিনশো পঁয়ষট্টি রকমের বাইরের। ছোঁড়াগুলোর কাজ-কম্মও জোটাতে পাচ্ছিনা, সামলাবারও হেকমৎ ফুরিয়েছে, ফলে ক্রমশ নতুন নতুন উৎপাত বাড়ছে।

সেদিন বাবুরা লাইব্রেরীর সাহায্য-কল্পে একটি ভ্যারাইটি শো-এর আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু মাঝ থেকে আমার লাঞ্ছনার অবধি রইলো না। আমার জন্যে ত চাঁদার ফাঁদ বাঁধা—গচ্ছা যা যাবার তা ত গেলই, উপরন্তু বেক্ষতালুর আধখানা চাক্‌লা উড়িয়ে পট্টি বেঁধে বসে আছি।

দু'হাজারবার ঐ দলের পাণ্ডা নতুন কর্তার মেজছেলে

কাৎলাটাকে নিষেধ করলুম, দেখ, কেৎলো, ও-সব ভ্যারাইটি-ম্যারাইটি করিস্‌নি,. ও অতি-নচ্ছার কাণ্ড—শেষ পর্যন্ত ভ্যা ভ্যা ক'রে কাঁদতে হবে। ও-সব ভদ্দরলোকের কাজ নয়, অতি হুজ্জুতের ব্যাপার—আসল. দিনে জন্মে কেউ পা মাড়াবে না। তার চেয়ে তোরা নিজেরা যা পারিস্ একটা কেলেঙ্কারী কর্, সেও ভাল, মারামারির হাত থেকে বাঁচবি—তা শুনতে তাদের ঘণ্টাটি!

ভুঁটে, হুড়্‌কো ন্যাংচা, কান্‌কো—সব কটা আমার বলবার আগেই 'কুড়িজন আর্টিস্টকে ঠিক ক'রে এসেছি, এখন আর কিছু বদলানো যাবে না', বলে সমস্বরে চেঁচিয়ে কাৎলাটাকে নিয়ে স্টেজ ঠিক করতে বেরিয়ে গেল।

সবেতে এদের বারফট্টাই ত? বলে, ভ্যারাইটি দেখে দেখে সর্বাঙ্গ জ্ব'রে গেল, এঁরা ভাবলেন ও বুড়োর কথা ছেড়ে দাও না, ও আর আজকালকার কি জানে?—আমি ত কিছুই জানি না, কিন্তু পরিশেষে নিজেরা ত চোখের জলের নোস্তা চাকলেনই, উপরন্তু আমাকে পর্যন্ত তা ধিন্ ধিন্‌তা নাচিয়ে ছাড়লেন।

নতুনত্ব ত কচু!—সেই মান্ধাতার আমলের আপনাদের চিরপরিচিত দিগ্বিজয়ীর দল, যাঁদের গান-বাজনা-বক্তিমে শুনে শুনে কান পচে যাবার উপক্রম, বাবুরা বললেন, তাঁদেরই আন্, না হলে প্রাণ আর বাঁচবে না—লোকের কাছে মানও থাকবে না।

আর আশ্চর্য লোকেরাও—ঠিক মুড়িমুড়কির মত টিকিট কিনে ফেললে। একাধারে আনন্দ ও চ্যারিটি করার পুণ্য এদেশের ধর্মপ্রাণ নরনারীরা ত কস্মিনকালেও সহজে সামলাতে পারে না কি না—তাই খদ্দেরের খাম্‌তি হল না। দু-একটি দামী আসন, যা মোটেই বিক্রী হ'ত না, তা জুলুম ক'রে আমাকে ও আর পাঁচজনকে গছালে। কি বলবো বলুন, এদের ত যুক্তি বলে কিছু নেই, বাপ-দাদা বলে খাতির করেও কেউ মুক্তি দেবে না—ওদের বিপক্ষে কিছু বলেছেন কি মেরে তক্তি বানিয়ে আপনাকে গলায় ঝুলিয়ে ঘুরবে। অগত্যা দশটি টাকা গচ্ছা গেল।

শেষ পর্যন্ত যখন দেখলুম, অনেকটা এগিয়েছে, হাজার হ'ক বাড়ির ছেলেপুলেগুলো যাতে মুশকিলে না পড়ে, তার জন্যেই জিগ্যেস করলুম, হ্যাঁরে, সবাই আসবে ত?

তক্ষুণি উত্তর—আসবে না মানে? সব্বাই কথা দিয়েছে যে, এরকম ভাল কাজে আমরা যাব না, তোমরা বল কি? তোমরা না বললেও আমরা হারমোনিয়াম কাঁধে নিয়ে যেতুম। শুনেই বললুম, তবেই হয়েছে, অত ভালমানুষী ক'রে এক কথায় যখন ওরা রাজী হয়েছে তখনই জানবে সেদিন ওরা ডিগ্‌বাজী খেয়ে বসে আছে। সময় বরাবর একজনের পেটে ব্যথা ধরবে, আর একজনের সকাল থেকে হেঁচ্‌কি উঠবে, তৃতীয়জন নিরুদ্দিষ্ট হবে, চতুর্থজনের পাত্তা মিললেও পিস্‌-শাশুড়ীর খুব বাড়াবাড়ি যাচ্ছে বলে সরে পড়বে—অতএব হাতে

ওদের কিছু দিয়ে আয়, এই ওদের ব্যবসা। বলে, পয়সা দিয়ে এলেও অর্ধেক সময় অনিবার্য কারণবশত আসে না, আর তোরা মুফত্‌সে কাজ সারবি, এ কি হয় ?

আর তা ছাড়া তোদের চ্যারিটি ভ্যারাইটি ত নিত্যি সকাল-সন্ধ্যে লেগে আছে, ও বেচারীদেরও কিছু না নিলে ত ভিটেমাটি চাঁটি হয়ে যায়—বুড়ো বয়েসে লাঠি ঠুক-ঠুক ক'রে ওরা হরিনাম গেয়ে বেড়াক্, এই কি চাস্? তবে দিবি নি কেন ?

তার উত্তরে কাৎলা বললে, সে আমরা গোড়া বেঁধে কাজ করেছি, অমুক অমুকের বন্ধু, সকাল-বিকেল একসঙ্গে ডন-বৈঠক করে, তাকে দিয়ে তমুককে ধরেছি। ও আর্টিস্ট যে দোকানে তানপুরো কিনে গলা সাধে, তার মারফৎ আমরা তাকে পাকড়েছি। ও আর্টিস্ট কাঁকুড়বাবুর বড়মামার পিসতুতো ভায়রাভাইয়ের একটু দূর-সম্পর্কীয় সতাতো সম্বন্ধী, তাকে একেবারে কথা দিয়েছে যে, ঠিক সময় পৌঁছবো—আর যাদের কিছু খাঁই আছে, তাদের নগদ পাঁচ টাকা, দশ টাকা বায়না দিয়ে এসেছি।

বেশ ভাল কথা—শেষ পর্যন্ত ভালয় ভালয় কাট্‌লে হয়।

ইতিমধ্যে শহরময় প্ল্যাকার্ডে প্ল্যাকার্ডে ছয়লাপ। অভূত-পূর্ব বিচিত্রানুষ্ঠান—ন্যাড়াপুকুর লাইব্রেরীর সাহায্যকল্পে বাঙলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীগণের একত্র সম্মেলন। অবিলম্বে আসন সংগ্রহ করুন, হৈ-হৈ, রৈ-রৈ কেলেঙ্কারী কাণ্ড।

প্রথমেই জনগণমন ও বন্দেমাতরম্ মিশ্রিত কোরাসে উদ্বোধন সঙ্গীত—জাতীয় উদ্দীপনায় সকলকে মাতাইবে। কোরাস গাইবেন—বন্ধনমোচন সরকার, জীবন্মুক্তি ঢালী, খুনখারাপী সরখেল, বিপ্লবী হালদার, তোৎলারাম তালুকদার, কুমারী ফণি-মনসা গাঙ্গুলী ও বিনুনি বাঁড়ুয্যে।

তারপর বৈঠকী সঙ্গীত—ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী। গাইবেন যথাক্রমে—হুহুঙ্কার চাটুজ্যে, ঠর্‌ঠরে দত্ত, ছিরকুটে ভট্‌চাজ, কঁাপুনি দেবী, কুমারী ঝির্‌ঝিরে সরকার।

আধুনিক সঙ্গীত গাইবেন—দোদুল্যমান পালিত, নির্নিমেষ শীল, উদাস মজুমদার, সুক্রন্দন মুকুজ্যে, ওরফে (হাঁপুবাবু), আধভাষিণী দেবী, যক্ষিণী মিত্র, পল্লবিনী সেন।

তারপর ভজন গাইবেন—ভক্তরাম মাইতি, ভেদভেদানন্দ সরস্বতী।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত—হিল্লোলিনী মুকুজ্যে, হাপুসনয়নী দত্ত, বিগলিতা ব্যানার্জী, কাঁদুনি কর।

ভাটিয়ালি ও পল্লীসঙ্গীত গাইবেন—গন্ধাখাঁদা হালদার, জয়দুর্গা সরকার, কুন্দুলী মজুমদার ও ভীমপলশ্রী ঘোষ।

হাস্যকৌতুকে থাকবেন—কাতুকুতু বসু, চিম্‌টি চক্রবর্তী ও চিট্‌পিটে সাহা।

যন্ত্র-সঙ্গীত—পাক্‌তেড়ে পাল, ওস্তাদ কুরকুরে খাঁ, ওস্তাদ তেরফঁাক্ মালেক, ঠনঠনিয়া মিশ্র ও ঝরঝরে পাল।

সঙ্গত করবেন—খড়খড়ী চক্রবর্তী।

নৃত্য—বেলুনবালা দেবী, বয়া সরকার, অনামী ঢোল ও কঞ্চি মজুমদার।

মানে বাঙলাদেশে আকর্ষণীয় বস্তুর এমন সমাবেশ আর এর পূর্বে হয় নি।

লোকে লোকারণ্য—গেটে মারপিট! কি ব্যাপার? না, যারা টিকিট না-কিনে ঢুকতে চায়, তাদের হটিয়ে যারা টিকিট কিনেছে, তারা ঢুকবে কেন? এই ব্যাপার নিয়ে মনে করুন, সেখানে সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে গেল, সভা বসলো, বক্তারা জনগণের দাবী নিয়ে বক্তৃতা শুরু ক'রে দিলেন, লোকে ক্ষেপে খোয়া আর ইঁট মেরে বাইরে ছ'চারটে ট্রামের আর বাসের কাঁচই ভেঙ্গে দিলে।

কিন্তু যাদের জন্যে এত কাণ্ড, তারা কৈ?

ছুঁটে দেখলুম একবার সাজঘর, একবার টিকিটঘর ক'রে

বেড়াচ্ছে, মুখে কথা 'নেই, ন্যাংচাকে যিনি আর্টিস্ট আনবার জন্যে গাড়ি দেবেন বলেছিলেন, তিনি সকাল থেকে উধাও। হুড়্কো চেয়ে-চিন্তে কোথা থেকে তবু একটা জোগাড় করেছিল, কিন্তু তার ড্রাইভার আর্ধেক রাস্তায় গিয়ে বললে, পেছনের দু'খানা চাকাই গেছে, একটাকে যা হ'ক ক'রে মেরামত করা যাবে, কিন্তু আর একখানা সদ্য দোকান থেকে কিনে না দিলে চলবে না।

শেষে কাৎলা ট্যাক্সি নিয়ে ছোটে—কিন্তু কোথায় কে? দয়া ক'রে দু-চারজন যাও-বা এল, বাইরের ছোঁড়াগুলো স্রেফ্ তাদের কাছা ধরে টেনে, চুলের মুটি ধরে বললে, আগে এইখানে গান গা, তবে ভেতরে ঢুকতে দোব বলে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে একটা ভাঙা টুলের ওপর দাঁড় করিয়ে প্রায় কাঁদাতে কাঁদাতে গাওয়ালে।

ঠিক সেই সময়, বেলুনবালা দেবীর বায়না নেওয়া ছিল, তিনি এসে হাজির। আর যায় কোথা—ছোক্‌রাদের লাফ দেবার শক্তি আগেকার চেয়ে ত এখন তিনগুণ বেড়েছে, তারা একেবারে লাফিয়ে উঠলো, আর কতকগুলি দস্যুস মার্কা ছোকরা একেবারে তারস্বরে 'এসেচে, এসেচে' বলে হনুমানের মত লাফ দিয়ে তাঁর মোটরের ফুটবোর্ডের ওপর তড়াক্ তড়াক্ ক'রে উঠে পড়লো। ঠেসে ধরলে বেলুন ফেটে যেত, কিন্তু ব্যাপার দেখে তিনি একেবারে ভয়ে চুপ্‌সে গেলেন।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদের সুরে বেলুনবালা পরিত্রাহী চেঁচাতে চেঁচাতে বলতে লাগলেন, এই ড্রাইভার, চালাও, চালাও বলে মোটরেই দৌড়।

হৈ হৈ কাণ্ড! ওদিকে ভেতরে কেউ নেই। যাঁরা মাতব্বরী কর্চ্ছিলেন, তাঁরা ব্যাপার-স্যাপার দেখে পগার পার। লোকের কণ্ঠে প্রথমে বেজে উঠলো বিচিত্র সুরবাহার, তারপরই মার মার। কাউকে খুঁজে পায় না।

শেষে মশাই, কে একজন বলে উঠলো, আসল মালিকদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বটে, কিন্তু ঐ ত ওদের বাড়ির লোক সামনের সিটে বসে—এই বলে আমার মাথার ওপরই টেলিগ্রাফের টরে-টক্কা শুরু করে দিলে, ছ'পয়সা ক'রে পচা হাঁসের ডিমের জোড়া আগে থেকেই বোধহয় কারুর মাথায় ছুঁড়বে বলে এনেছিল, তাই তাক্ ক'রে মেরে মাথার টাক আধ-ফাঁক ক'রে ছেড়ে দিলে। চেয়ার-টেয়ার ভেঙ্গে একাক্কার। কার কি করছে, সে বোঝানো সাধ্যি কার।

হতভাগাদের তারপর থেকে আর দেখা নেই। এসব দেখে-শুনেও বাঁদরগুলোর আক্কেল হয় না। এইবার ভ্যারাইটির নাম করুক না, একেবারে লাঠির বাড়ি পিত্তি ছরকুটে দেব!

প্রত্যুপকারের পাক

পই পই ক'রে গুরুদেব বলে গিয়েছিলেন যে, বাবাজী পৃথিবীতে সব কোরো, কেবল বুদ্ধি ক'রে কারুকে নিজের উপকার করতে বোলো না; জান নিক্‌লে যাবে তার প্রতিদান দিতে দিতে। কথা শুনিনি, তার ফলে এখন সর্বাঙ্গ ব্যথায় কট্‌কট্‌ কচ্ছে।

মশাই, বছর পনেরো আগে আপনাদের পরিচিত সেই ঘুঘু ভট্‌চার্যি মশায়ের কাছ থেকে একটি বিষয়ে সাহায্য চেয়েছিলুম, তিনি অনুগ্রহ ক'রে তৎক্ষণাৎ আমায় সে সাহায্য দিয়েওছিলেন কিন্তু তারপর থেকে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো! ব্যাপারটি সংক্ষেপে বলি—পুরীতে স্বর্গদ্বারের কাছে তাঁর একখানি পোড়ো বাড়ী ছিল, তিনি একসময়ে সপরিবারে মাসখানেক বিনা ভাড়ায় আমায় সেখানে থাকতে দেন—তাও বাড়ীর অবস্থা দেখে মিস্ত্রি ডেকে প্রায় গোটা পঞ্চাশ টাকা খরচা ক'রে তাকে বাসযোগ্য ক'রে তুলি কিন্তু তারপর থেকেই ঘুঘু বাবু ঘুরঘুর করতে করতে আমায় এত ফরমাস ক'রে যাচ্ছেন যে, এখন মাথাঘুরে কোন্‌দিন রাস্তায় পড়বো কিনা তাই ভাবছি!

মানে, মাসে তাঁর চারটি ক'রে অনুরোধ রক্ষা করতে না

পারলে তিনি ভাবেন আমার ঋণ শোধ হবে না। চক্ষু-লজ্জাবশত বাক্‌রোধ ক'রে তাঁর আদেশ পালনের জন্য অবিরত চেষ্টা করে যাচ্ছি কিন্তু তাতেও তাঁর হিসেব মিটছে না। পাড়াশুদ্ধ, দেশশুদ্ধ লোকের কাছে তিনি প্রচার ক'রে বেড়িয়েছেন যে, তিনি আমার এক সময় কি উপকার করেছিলেন, এখন প্রত্যুপকার না করলে সবাই জানবে যে, আমার মত পাজী হাড়হাবাতে লোক বোধহয় আর ত্রিভুবনে নেই। অগত্যা নীরবে প্রত্যুপকার করবার আশায় তাঁরই চারধারে পাক মারছি।

আজকাল তাই শরীরে একটা ফোড়া হলে কাউকে ছুঁচ দিয়ে সেটা গেলে দিতে বলি না—কারণ জানি তারপর ঐ ছুঁচ ছুঁচো হয়ে পেছনে তাড়া করবে। ভাবাটা যে অন্যায় নয় তা আমার অবস্থা শুনলেই বুঝতে পারবেন।

আমার ন' ভাই প্রেসে কাজ করে—অতএব ঘুঘুবাবুর বাড়ীর এ যাবৎ পনেরো জনের বিয়ের প্রীতি-উপহার বাহার ক'রে ছেপে প্রত্যুপকার করতে হয়েছে, তাও কাগজের দাম মেলেনি। কবিতা লিখেও দেননি, সেটা আবার আমায় পাঁচজনের প্রীতি-উপহার থেকে টুকে মেরে দিতে হল।

তারপর, তাঁর বাড়ীতে জলসা হবে, ঘুঘুবাবুর আব্দার —তোমার পরিচিত যত গাইয়ে বাজিয়ে আছে বিনিপয়সায় তুমি যোগাড় ক'রে আন, তিনি দয়া ক'রে তাদের দুটি সিঙ্গাড়া, একখানা নিমকি, একটি মিষ্টি আর এক কাপ চা

খাওয়াবেন। নিয়ে আসা, পাঠানো—তোমার ব্যাপার, তিনি এ সব হাঙ্গামায় নেই। তাদের জন্য হারমোনিয়াম, বাঁয়া তবলা থেকে তানপুরো খঞ্জনী সব তুমি যোগাড় ক'রে আন, কারণ গানবাজনার তিনি কিছু বোঝেন না। তাঁর নাতি হয়েছে তাই তিনি বাড়ীতে সাথীদের জন্যে একটু আনন্দের ব্যবস্থা করতে চান—এই আর কি! তারা যখন এল তখন কারুর কিছু শুনলেন না, ওপরে পাঁচজন আত্মীয়স্বজন খাচ্ছেন, তাঁর কি বৈঠকখানায় বসে চুপ ক'রে গান শোনবার সময় আছে? বরং কেউ থামলে চটে যাচ্ছেন, আসর ফাঁক যাচ্ছে বলে!

এর পরের দফা। আমি আপিস কোয়ার্টারে চাকরি করতে যাই, অতএব তাঁর বড় ঘড়িটা যদি সস্তায় কোন দোকানে মেরামত ক'রে দিই, তাহ'লে তাঁর একটু উপকার হয়, তাই তিনি সেটি আমার ঘাড়ে ঠিক ট্রামে ওঠবার সময় চাপিয়ে দিলেন। ঐ ভীড়ে

ঘড়ি সমেত পড়ি কি মরি ক'রে কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে ট্রামে উঠলুম, উঠে গাল খেলুম আরও বেশি।

'সবাই সচীৎকারে বলে উঠলো, বেলা ৯॥টার সময় ঘড়ি ঘাড়ে ক'রে যারা ট্রামে ওঠে তাদের গলায় দড়ি জোটে না, এই আশ্চর্য! লোকটার কমন্‌সেন্স বলে এতটুকু জিনিস নেই—আ মলো যা!

তিনজন কনুয়ের ধাক্কা দিয়ে কাঁচটাই ফাটিয়ে দিলে। মেরামত খরচা হ'ত পাঁচটাকা, আমার জিম্বায় ড্যামেজ হওয়ায় সেটা দাঁড়ালো পনেরোয়, দশটাকা খামকা গচ্ছা গেল। যাক্ সেটা কাটলো, তারপর আর একটা।

ঘুঘুবাবুর ছোট ছেলে ন্যাবার চাকরি বাকরি নেই, আমাদের বড় সাহেবকে বলে তার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতেই হবে। আমি যত বলি, মশাই, বড় সাহেব কি বলছেন আমি বড়বাবুর কাছ পর্যন্ত আজও ঘেঁসতে পারি না—তা কে শোনে সে কথা!

তিনি দরখাস্ত সমেত ছেলেকে রোজ আমার আপিসে দেখা করতে বলে দিয়েছেন। ছেলেও ছিনে জোঁকের মত প্রত্যহ লেগে আছেন আর আপিসে বড়বাবু আমার পাশে অবিরত একটি লোককে বসে থাকতে দেখে ভাবছেন আমি আড্ডা দেবার জন্যে একটা লোককে ধরে এনেছি। এইবার আমার চাকরিটাও না যায়।

ঘুঘুর মাঁসতুতো সম্বন্ধী ইন্সিওরের দালালী করে—অতএব তার মারফৎ আমাকে একটা হাজার পাঁচেকের ইন্সিওর করানো চাইই।

আমি তাঁকে যত বলি, মশাই, আমি ত মরেই আছি, একে কি বাঁচা বলে ?

তিনি হেসে বলেন, দূর মশাই, প্রাণ পাখী আগে খাঁচা ছেড়ে বেরোক্ তবে ত সত্যি মরবেন। নিন্ সই করুন।

প্রত্যেক মাসে তাঁকে পরের মাসে আসতে বলছি তিনিও ফি মাসে একখানি তাঁর কোম্পানীর বই নিয়ে আসছেন আর শুনিয়ে যাচ্ছেন, দেখুন যত মরবার টাইম ঘনিয়ে আসছে তত প্রিমিয়ামের টাকা বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু।

ঘুঘুবাবু বলে দিয়েছেন, আমাকে একটু চেপে ধরলেই হবে, তাই তিনি চাপছেন। মানে এমন অবস্থা ইনি করেছেন যে, আমায় একদিন ক্ষেপে এঁকে কামড়ে দিতে হবে বোধহয়।

এরপরও আছে। সম্প্রতি ঘুঘুবাবু একটি ঘিয়ের ব্যবসা ফেঁদেছেন, টাটকা খাঁটি গব্য ঘি অতএব পয়সা মাটি না ক'রে তাঁর কাছ থেকে আট টাকা ক'রে অন্ততঃ একসের ঘি

মাসে একবার কিনতেই হবে। তাছাড়া আসামের জঙ্গল থেকে একেবারে চমৎকার চা তিনি আমদানি করছেন, সেও তিন টাকা পাউণ্ড, তা খেয়ে খারাপ লাগলে তিনি দাম ফেরৎ নেবেন বলে এগারোটা টাকা একেবারে মাসের গোড়ায় এসে নিয়ে গেলেন। সেই ঘি খেয়ে বাড়িতে তিন জনের পেট ছেড়ে দিয়েছে, চা খেয়ে গা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। বলতে, বললেন, ভাল জিনিস সবার পেটে ত' আর সয়না, ভেজাল খেয়ে অব্যেস, তোমরা তাই খাও!

ভাবলুম, যাক্‌ রেহাই পেলুম কিন্তু রেহাই কি অত সহজে পাওয়া যায়, তাঁর হবু বেয়াইকে দিয়ে কতগুলো ব্যবস্থা করিয়ে দিতে হবে আমায়। তাঁর মেয়ে টেংরির বিয়ে। যাঁর ছেলের সঙ্গে তার সম্বন্ধ তিনি যেহেতু আমার ক্লাসফ্রেণ্ড্‌ অতএব তাঁকে মেণ্ড্‌ ক'রে মেয়েটিকে যাতে তিনি শাঁখা সিন্দুর দিয়ে নিয়ে যান তার জন্যে তুমি গিয়ে তাঁর পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়! ছেলেবেলায় একসঙ্গে পাশাপাশি পড়েছ এখন নয় আর একটু কেংরে পড়লে। বিয়ে ঠিক হলেও মুক্তি নেই, বাড়ীতে পান্তুয়া হবে তার ছানা পাওয়া যাচ্ছে না, তুমি একটু এদিক ওদিক আনাগোনা ক'রে তার ব্যবস্থা ক'রে দাও!

তাও করলুম, পরে অনুরোধ এল একটু বিনীতভাবে। মেয়ে জামাই জোড়ে এসেছে, দিন তিনেক থাকবে, ইতিমধ্যে একটা থিয়েটারের পাশ এনে দাওনা, তোমার ত কত চেনা-শোনা আছে, বাড়ীর জন নয়েক যাবে এই ত!

পাড়ায় শেতলা পূজো হবে, ঘুঘুবাবু তার সেক্রেটারি, অতএব গোটা পাঁচেক টাকা তোমায় দিতেই হবে। ছেলেরা থিয়েটার করবে, তুমি যে বড় তক্তাপোষটায় শুয়ে থাক ওটা ছেড়ে দাও, স্টেজ হবে—একদিন নয় মাটিতে শুলে, না হয় সে রাতটা না-শুয়ে থিয়েটার দেখেই কাটালে—ওটার ওপর থেকে বিছানাপত্তর এখন তোল।

বুঝুন, পুরীতে তাঁর বাড়ী গিয়ে হাওয়া খাওয়ার ঠেলা! এরপর আরও আছে। ছেলেরা ক্লাসে উঠেছে, যেখান থেকে কমিশন পাওয়া যায় সেখান থেকে বই কিনে এনে দিতে হবে, বড় ছেলের পেট ফোলে কিছু হজম হয় না, তার জন্যে আট টাকার চেনা ডাক্তারকে চার টাকা করাতে হবে! ছোট মেয়ে নেংটি খেয়াল গান শিখেছে তা রোজ আপিস থেকে ফিরে ঘণ্টা দুয়েক ক'রে শুনতে হবে।

এতদিন অনেক সহ্য করেছিলুন কিন্তু এ যন্ত্রণা বেশিদিন ভোগ করতে পারলুম না। দেখলুম যে দাদার আবদার ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, ইনি আমায় মৃত্যুকাল পর্যন্ত রেহাই দেবেন না। অতএব বে-জায়গায় তেহাই না মারলে আর ছাড়ান নেই। অবশেষে তাই করলুম। একদিন গানের আসরেই চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে বলে ফেললুন, ভট্টাচার্যি মশাই ভাল চান ত মেয়ের গান মা গঙ্গার জলে সমর্পণ ক'রে আসুন!

তিনি চটেমোটে বলে উঠলেন, মানে?

—আমিও বলে উঠলুম, মানে সজ্ঞানে এ গান কেউ শুনতে পারে না। মেয়ের যদি বিয়ে দিতে চান আর বাসর ঘরেই জামাই বাবাজীকে যদি অজ্ঞান করানোর ইচ্ছে না থাকে তাহ'লে কালই ওকে গঙ্গাস্নান করিয়ে ইতি করুন। লোককে কি পাগল করতে চান ?

আর যায় কোথা! এরপর থেকেই গণ্ডগোল শুরু। তিনি আমায় নাকি আড়ালে গরু, ঘোড়া, গাধা, শুয়ার ইত্যাদি নানা প্রকার জীব-জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা দিচ্ছেন কিন্তু আমি প্রত্যুপকার দায়িত্ব এড়িয়ে রাস্তায় একটু হাঁপছেড়ে সকাল বিকেল ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ঘরের কেচ্ছা

গোমুখ্যু না হলে কেউ ঘরের কথা বাইরে আলোচনা করে না জানি—কিন্তু যদি কোন ভদ্রলোকের প্রায় রাঁচির মানসিক আগারে যাবার অবস্থা হয়ে আসে তখন সে কি করে ? আমার অবস্থা প্রায় সেই রকমই হয়ে এসেছে বলেই ঘরের কেচ্ছা আচ্ছা ক'রে লোক সমাজে বলতে হচ্ছে।

সেজ কর্তার এই সাত দিন আগে একটি পুত্র সন্তান হয়েছে, কাল তাঁর আটকড়াই হবে, অতএব একটু ধূম ধাড়াক্কা কর। মানুষের আক্কেল বলে একটা জিনিস থাকে ত সেটা ক্রমশঃ জগৎ থেকে উপে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। আটকড়াইয়ের জন্যে সবাই ব্যস্ত, কারণ তাঁর সাত সাতটি মেয়ের পর সবেধন এই নীলমণিটি এসেছেন, অতএব একটু ঘটাঘুটি হবে না ?

এই বাজারে একটা ছেলে হলে ভাবনায় হাত-পা মেলে কোথায় বিছানায় লোকের শুয়ে পড়া উচিত, কিন্তু তার পরিবর্তে এদের আনন্দ একেবারে বুক ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। বলবার জো নেই—তাহ'লেই আমি মন্দ, আমার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখাই নাকি পাপ !

এই বাজারে-লোকে কি ক্যালকুলেশনে যে ছেলেমেয়ে আমদানি কচ্ছে, আমার ত মাথায় ঢোকে না। খাদ্য নেই,

বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই অথচ পিলপিল ক'রে ছেলেমেয়ে এসে বাড়িতে কিল্‌বিল্‌ করছে। খিল বন্ধ ক'রে ত আর এদের আগমন বন্ধ করা যায় না, অতএব কিল খেয়ে চুপ মেরে বসে থাক!

আসল কথা, আমি দেখছি যে দেশে আর একবার গুটি কতক বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর চট ক'রে না জন্মালে আমাদের মুক্তির অপর কোন উপায় নেই! সংসারের শতকরা আশিজনকে যদি না সন্ন্যাসী বানানো যায়, তাহ'লেই মুশকিল! লোকের সংখ্যা না কমাতে পারলে বাঁচা অসম্ভব!

ভারতবর্ষ এক সময় বৌদ্ধমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে তাই বেঁচে গেছলো, বহুদিন বহুলোক সংসার পাতে নি, অন্যান্য মহাপুরুষরাও এ বিষয়ে বহু হেল্প ক'রে গেছেন, কিন্তু ইদানিং এই বিজ্ঞানের যুগেও কী কেলেঙ্কারী হচ্ছে স্বচক্ষে দেখছেন ত? চ্যাঁ ভ্যাঁর ঠেলায় ত অন্ত নেই। খাট, তক্তপোষ সব ভরে গেছে বাকি ছিল ভাঁড়ারের তাক, তাতেই লোকে থাক্‌ থাক্‌ ক'রে ভাবী বংশধরদের শুইয়ে রাখছে, তাও দেখে এলুম। মশাই, পৃথিবীতে পঞ্চাশ কোটি লোক বেড়েছে গত কয়েক বছরের ভেতর, এর ওপর সেজবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন? ছেলের আটকড়াই হচ্ছে—উঃ! ধন্যি লোক সব।

বাড়ির পাশে এক ভদ্রলোকের আবার কাণ্ড দেখছি। ছেলে হয় নি বলে তাঁর আর তাঁর পরিবারের দুঃখের অন্ত

নেই। নানা রকম চেষ্টা চরিত্র করেও কিছু হয় নি. ডাক্তার-বদ্যি হার মেনে গেছে, এখন দৈব নিয়ে পড়েছেন, যদি সেখান থেকে দেবতারা দয়া ক'রে এইবার কাউকে পাঠান তবেই রক্ষে, নইলে এ'রা যে কি করবেন জানি না! কতদিন বলেছি, মশাই, আমাকে পুষ্যি নিন্। একটু বয়েস হয়ে গেলেও সংসারের চাপে পড়ে হামাগুড়ি দিতেও শিখেছি, বৈঠকখানায় শুইয়ে রাখবেন— তা তিনি শুনবেন না। এই ত আশপাশেরও অবস্থা!

এর ওপর আবার ব্যাপার জানেন? বাড়িতে ধুমসোটার বিয়ে দেবার জন্যে সবাই মাথা ফাটাফাটি কচ্ছে, কিন্তু আমি স্রেফ্ ন'বাবুকে বলে দিয়েছি যে, ছেলের যদি বিয়ে দিতে চাও ত আগে তার জন্যে একটা ফ্ল্যাট দেখ, কারণ বাড়িতে আর জায়গা নেই—তোমাদের জ্বালায় রাত্তিরে কলঘরে চৌকি পেতে শুতে হচ্ছে, আর বেশি এগোতে পারবো না। ন'বৌমা তাই শুনে নাকি বলেছেন, তাই বলে কি লোকে একটু সাধ আহ্লাদ করবে না?

আমি বলেছি, আমাকে ঘোড়া ক'রে তোমাদের মনোরথ ছোটালে ভাল হয় তা জানি, কিন্তু এ ভাবে ছুটে যে আমার

স্বয়ত বদলে এল, এখন পুষ্পকরথে চেপে আগে পালাই, তারপর যা-খুশী কোরো! আমার কথা শুনে সব রেগে খার, অন্যেরা দু'চারবার গজ গজ ক'রে গেলেন, শুধু পরিবার এসে রেগে বলে উঠলেন, তোমার সব কথায় থাকবার দরকার কি? যাদের ছেলে তারা বুঝবে।

কিন্তু সংসারে যে কেউ কোন ভাল কথা বুঝছে না বলে জগতে এত অশান্তি, সেটা আমি তাঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না। ঠেলা পোয়াবার সময় তুমি আর গভর্নমেন্ট—আমরা যা-খুশী নির্বিবাদে ক'রে যাই, এই আর কি! এতে দেশের উন্নতি হবে—হায়রে!

তার ফল হচ্ছেও তেমনি। নিরঙ্কুশভাবে ফাঁকি আর চুরি বেড়ে চলেছে। যে-যা পাচ্ছে চুরি করছে, ধেড়ে, নেংটে, ছিঁচকে কেউ বাদ নেই! কারণ সংসার চালাতে হবে ত—এতগুলি হাঁ কে বন্ধ করাতে হবে, লোক লৌকিকতা, সমাজ বাঁচাতে হবে ত? অতএব চক্ষুলজ্জা, ভদ্রতা, ধর্মবোধ, বিবেকের দংশন, স্বজাতিপ্রীতি সব বাদ দাও!

সমাজ, বংশ, জাতকে রক্ষা করা খুব বড় জিনিস মানি, কিন্তু এযুগে বেকার একটা ছেলেকে যে সংসারের ঘানিতে যুতে দেব তা কোন্ ভরসায়, আপনারাই বলুন! তারপর যখন বংশ, বংশাবতংস, কঞ্চির ছোটখাট অংশ বাড়ীর চারধার থেকে খোঁচাতে শুরু করবেন, তখন কোথায় পালাব বলুন?

তা না হলে সাধে বিয়ে আর আটকড়াইয়ের বিরুদ্ধে চেল্লাচ্ছি আর বলছি যে কারুর আক্কেল বলে জিনিস নেই !

বলে, যে কটা ছেলে আছে তাদেরই কেউ মানুষ করতে পারছে না—এর ওপর আবার ? যদি বলেন, তোমার দোষ। এত লোকের ছেলে মানুষ হচ্ছে কি ক'রে ? কি ক'রে যে সবাই ম্যানেজ করছে বুঝতে পারি না। এক একটা ছেলে আর মেয়ের পেছনে গড়পড়তা, মানুষ করা ছেড়ে দিন, শুধু ফানুসের মত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রাখতে গেলে কত পড়ে, একবার ভেবে দেখুন ত দয়া ক'রে। আমার ছেলেদের ত লক্ষ্মীছাড়া বলে আপনারা সবাই গাল দেন, কিন্তু মা লক্ষ্মী যে আমার ঘরের চুপড়ির মধ্যে থেকে কবে সরে পড়েছেন তা ত জানেন না। যেখানে মা ষষ্ঠীর দৌরাত্ম্য সেখানেই দেখেছি ঠাকরুণ মাথায় যষ্ঠি মেরে কাহিল ক'রে দিয়ে বেরিয়ে গেছেন। অন্ততঃ আমার বেলায় ত তাই করেছেন। কি ক'রে ছেলেপুলেদের সামলাই ?

ধুম্‌সোটার কথাই ধরুন। তার সকাল বেলায় চা, জলখাবার, ডিম টোস্ট্‌ ইত্যাদি আছেই। তিনি আবার শরীরের তাকত্‌ করতেন বারবেল, আর মুগুর ভেঁজে। আমি সেদিন

টের পেয়ে সেগুলো দূর ক'রে দিয়েছি, বলেছি ও-সব এ বাড়িতে হবে না। তোমার স্বাস্থ্য বজায় বাবদ যে ব্যয় হচ্ছে, তা সামলানো আমার বাবা বেঁচে থাকলে তাঁরও পক্ষে সম্ভব হত না। প্রত্যেকের চেয়ে দু' তিন সের বেশি খোরাক যোগানো এ বাজারে অচিন্ত্যনীয়—তুমি ক্ষিদে মার, জ্যাঠার কথা শোন, আর ল্যাঠা বাড়িও না। বাবু রেগে গুম্ হয়ে রইলেন, কিন্তু বজ্জাতি যাবে কোথায়! সেদিন পটকার মুখে শুনলুম যে ধুমসো দা' এখন রোজ ছাতে ভোর বেলায় উঠে একশো চল্লিশটা ক'রে নাকি ডন বৈঠক দেয়। দেখলেন পজোমী!

যাক, এইবার আসুন ন্যাংচার দিকে। স্কুলের মাইনে পাঁচ টাকা, উপরি আরও পাঁচ অর্থাৎ পাংখা ফি, স্পোর্টিং ফি, পিকনিক ফি ইত্যাদি লেগেই আছে। পেছনে পঁচিশ টাকার পঁচিশ দিন কামাই-করা একটি মাস্টার আছেন। পৃথিবীতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের যাবতীয় জ্ঞান তিনি সব এক ঘণ্টার মধ্যে শিখিয়ে যাচ্ছেন, তার ফলে এই বার নিয়ে তিনবার সে ম্যাট্রিকে ফেল মারলে।

এ ছাড়া মনে করুন, বাড়িতে হোঁৎকা, কেঁচো, ফচ্‌কে, পটকা ও আরও গুটি বার বর্তমান। এরপর আছেন মেয়ের দল। তাদের খাওয়া-পরা ছাড়া ইস্কুল আছে, কলেজ আছে, নাচ আছে, গান আছে, সিনেমা আছে, বন্ধুদের বাৎসরিক জয়ন্তী আছে, তার জন্যে অশান্তি বড় কম পেতে হয় না।

অতএব আমি কি ক'রে বিয়ে, আটকড়াই, বংশরক্ষাকে সমর্থন করি, বলুন।

যদি বলেন, নাচের খরচটা বাদ দাও না কেন? খেপেছেন? তাহ'লে বিয়ে হবে? নাচুনে মেয়ে ছাড়া এখনকার খুব কম ছেলেই বিয়ে করতে চায়। বলে, আমাদের পাড়ায় চাটুজ্যে মশায়ের মেয়ে গুড়গুড়িটার পাকা দেখার পর ঐ জন্যে তিন মাস বিয়েই বন্ধ রইল। তারপর কোনরকমে ধপড়্‌ধাঁই শিখে নাচতে নাচতে পেরিয়ে গেল। যাক্, এ একটা অনিবার্য আইটেম, ও নিয়ে তর্ক চলে না, ছেড়ে দিন—এ ছাড়া আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে লোক লৌকিকতা, বাজার, ডাক্তার, সত্যনারায়ণ ইত্যাদি পাঁচফোঁড়ন বাবদ কত পড়ে, একবার কাগজ কলম নিয়ে খতিয়ে দেখুন।

আমাদের ছ'টি ভাইয়ের কুড়িয়ে বাড়িয়ে কেরানীগিরি ক'রে রোজগার তিনশো থেকে চারশো অথচ বাইরে ভদ্রতার ঠাট বজায় রাখতে হচ্ছে প্রায় লাটবেলাটের মত। না রাখলে চলে না, কারণ একেবারে 'নো হোয়্যার' হয়ে যাবেন সকলের কাছে। এখনও কংগ্রেস বা কম্যুনিস্ট কেউই ত আর শ্রেণী বিভাগ বরবাদ ক'রে দিতে পারেন নি। করলেও চাপ কমবে না—কারণ ভাবপ্রবণ জাত ত আমরা। এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে দাঁত ছরকুটে যায়, তবু পাঁচজন বসে থাকলে দাঁত বার ক'রে তাঁদের হাতে কচি ছেলে সঁপে দেওয়ার দুঃখু বুকে নিয়ে এক একটি গুঁজে দিতে হয়। তখনও তাই হবে।

হাস্যরসিকের হাল

এ পোড়াদেশে আর যাই চলুক মশাই, হাসি চলে না। এ দেশে সবাই গম্ভীর, সবাই পাকা, সবাই জ্যাঠামশায়ের দল। হাসির লেখা, হাসির ছবি, হাসির গল্প, হাসির সিনেমা যাই করুন, লোকে দেখে এসে অতি গম্ভীরভাবে বলবে, দূর কি করেছে, শুধু ফক্কুড়মি, কিছু নেই ওতে। কিন্তু চ্যাংড়ামো করলে লোকে হেসে আটুপাটু! অতি সূক্ষ্ম বোধশক্তি এই জাতের কিনা, তাই নির্বোধের মত একটা কেলেঙ্কারি না করলে এ জাতের মুখখানা একটুও তুমড়বে না। যারা হাসাতে গিয়েছে তারা শেষ পর্যন্ত কেঁদেছে এবং যেই লোকে তাদের কোকিয়ে কান্না শুনেছে অমনি হেসে লুটোপুটি খেয়েছে। অদ্ভুত কাণ্ড!

ভদ্রভাবে হাসাবার উপায় নেই—ফুটপাতে চিৎপাত হয়ে শুয়ে ঠ্যাং ছুঁড়ে, কোঁচাকাছা জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, মুখ ভেংচে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে যদি হাসাতে পারেন, তবে হয়তো একটু শ্রীমুখ ফাঁক হবে, নচেৎ হাঁকডাকই সার। কোন্‌টা হাসির আর কোন্‌টা সিরিয়াস ব্যাপার এর পার্থক্যই লোকে আজও বুঝল না—ঠিক যথাসময়ের বিপরীত ভাবের প্রাবল্যে বুদ্ধিমান লোকদের থ বানিয়ে এরা লোককে নস্যাৎ ক'রে দেবে। খুব

হাসির কথা হলেই এদের মুখ লক্ষ্মীপ্যাঁচার মত হয়ে গেল, কিন্তু গম্ভীর ব্যাপার খুব মুখ হাঁড়ি ক'রে বলে যান, অমনি দেখবেন চতুর্দিক থেকে একজন কেউ খেই ধরিয়ে দিলেই হ'ল —একেবারে হে-হে ক'রে দাঁত খুলে পড়ে যাবার যোগাড়। অতএব হাস্যরস নিয়ে কারবার করতে গেলে ভয়ানক রসের রসিক হোন, তা হ'লেই লোক হাসাতে পারবেন।

মশাই, কথাগুলো কি সাধ ক'রে বলছি—অনেক দুঃখে বলতে হচ্ছে। একবার কয়েকজন ভদ্দরলোক এসে আমায় ধ'রে পড়লেন তাঁদের আপিসের ক্লাবে গিয়ে একটু হাস্যরস বিতরণ করতে হবে আমায়। গঙ্গার ধারে এক জেটির ওপর আপিস, সেখানকার কাজ শুধু মালের হিসেব রাখা।

অনেকগুলি কেরানী আছেন, তাঁরা কেউই সাহিত্যরসের রসিক নন সত্যি, কিন্তু শুনলুম তবু তাঁরা সাহিত্যিক-দের শ্রাদ্ধসভা করতে ছাড়েন না। বঙ্কিম চন্দ্রের স্মৃতি-বার্ষিকীর আয়োজন করেছেন, বড়বাবুর সনির্বন্ধ অনুরোধ আমাকে যেন-তেন-প্রকারেণ নিয়ে আসতেই হবে।

আমি বললুম, মশাই, মাপ করুন, আমি কি ক্লাউন, না, ক্যারিকেচারিস্ট যে আমাকে ধ'রে টানাটানি করছেন? ও আমি পারব না। এই কথা শুনেই তাঁদের কি হাসি! ওরে বাবাঃ, আপনি এই রকম দু-চারটে বুলি দিলেই বুঝলেন না, লোকে খুব আনন্দ করবে—বুঝছেন না, হেঃ-হেঃ-হেঃ-হেঃ—

কিছুতেই নিরস্ত করতে পারি না তাঁদের, যেতেই হবে, বড় বড় সব সাহিত্যিকরা আসছেন। আমি তবু টললুম না, বরং বললুম, বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রাদ্ধবাসরে হাসাব কি মশাই? সেখানে বরং বক্তৃত-টক্তৃতা দেওয়ান।

তাঁরা তবু বলেন, আজ্ঞে সে-সব কেউ শুনবে না বলেই ত দু-চারটে কমিক করবার বন্দোবস্ত করেছি।

আমি ত এদের কথা শুনে তাজ্জব ব'নে গেলুম। এরা বলে কি! শুনলুম ড্যান্সিং পার্টিরও বন্দোবস্ত করবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু খরচা বেশি পড়বে শুনে কমিটী টাকা পাস করে নি—অগত্যা এখন কমিকের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

শেষে নানা অসুবিধের অজুহাত দেখিয়ে তাঁদের ভাগালুম। ও মশাই, পরদিনই তাঁরা আমার এক বিশিষ্ট সাহিত্যিকবন্ধুকে নিয়ে এসে হাজির। তিনি একেবারে ধ'রে পড়লেন, তাঁর শালা সেই আপিসে কাজ করেন, আমাকে যেতেই হবে।

আমি বললুম, তা নয় যাব, কিন্তু কমিক করব কি ক'রে মশাই?

তিনি হেসে বললেন, কেন, বঙ্কিমবাবুর একটা হাসির

লেখা পড়বেন, তাহ'লেই, বুঝছেন না, লোকে খুব আনন্দ পাবে এবং সেটা সময়োচিতও হবে।

অগত্যা বাধ্য হয়ে যেতে হ'ল। সেদিন শনিবার। বেলা দু'টোয় আপিসের ছুটি হয়ে গিয়েছে—নীচেকার সব কেরানী পালিয়েছে, কিন্তু দোতলার আর তেতলার কেরানীদের পালাবার অবস্থা নেই। কেননা বড়বাবু সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা যেতেই হে-হে ক'রে একগাল হেসে তিনি আমাদের একটি হলে বসতে বললেন। হল খালি, আমি আর আমার সেই বন্ধুটি গিয়ে বিশিষ্ট অতিথিদের স্থানে গিয়ে বসলুম। আমরা যাবার পর অতি নিরীহ গোছের দু-চারটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক পেছনের বেঞ্চিতে একেবারে নিরুপায়ের মত আসন গ্রহণ করলেন দেখলুম, সম্ভবত বড়বাবুর ভয়ে।

তেতলার কাঠের সিঁড়িতে হঠাৎ হুড়্মুড়্ ক'রে একটা আওয়াজ হতেই দেখি, বড়বাবু জন তিনেকের ঘাড় ধ'রে ধাক্কা মেরে হলে ঢুকিয়ে দিলেন। কতকগুলি লোক ঝাঁক বেঁধে পালাবার তালে ছিল। কিন্তু সবাই সুবিধে ক'রে উঠতে পারলে না বুঝলুম। বড়বাবু তিনটেকে ঘরে নিয়ে আসবার সময় আবার কতকগুলি দুড়্দুড়্ ক'রে পালাল।

রেগে ঘেমে বড়বাবু অস্থির। আবার জন চারেক খানিক বাদে ধরা পড়ল। বড়বাবু চীৎকার ক'রে বললেন, মুকুজ্জে, কোথায় যাচ্ছ ?

আজ্ঞে, সাড়ে চারটেয় আমার লাস্ট ট্রেন, তারপরে একেবারে সাড়ে নটায়, তাই একটু আগে—

মুকুজ্জের ওপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে বড়বাবু বলে উঠলেন. খুব লায়েক হয়েছ দেখছি, শিগগির ঘরে ঢোক বলছি, নইলে কুরুক্ষেত্তর করব।

অগত্যা মুকুজ্জে বিড়বিড় ক'রে অনুযোগ জানাতে জানাতে একটি বেঞ্চির পেছনে ধারের দিকে বসে রইল—ইচ্ছেটা মীটিং শুরু হলেই পালাবে। এইভাবে দেড় ঘণ্টা ধরে ধস্তাধস্তি মার পিটের পর জন বাইশ লোককে সভাক্ষেত্রে ঢোকানো গেল। ইতিমধ্যে সভাপতি মহাশয় এসে গিয়েছেন, তিনিও প্রায় আধ ঘণ্টা বসে, আরও দু'জন সাহিত্যিক এসেছেন বক্তৃতা দিতে।

বড়বাবু তাঁর সহকারীকে সিঁড়ির কাছে তদারক করবার জন্যে রেখে ঘরে ঢুকলেন। আসবার সময় বলে এলেন, একটাকেও বেরোতে দেবে না বলে গেলুম, যত সব—

আমি ত ভেতর ভেতর ঘামতে আরম্ভ করেছি এই ভেবে যে, এ কোথায় এলুম! আমার সাহিত্যিক বন্ধুটির মুখও শুকিয়ে গেছে ব্যাপার-স্যাপার দেখে। ইতিমধ্যে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থন পেয়ে সভাপতি মশাই আসনে বসলেন। একটি ভাঙা হারমোনিয়ম নিয়ে একটি তরুণ কেরানীবাবু রাসভ কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ গান শুরু করলেন; কিন্তু তাঁর আবার সব লাইন মনে নেই, উল্টে পাল্টে খিচুড়ি ক'রে কোনমতে তিনি গান শেষ করলেন।

এর পরেই কমিক। আমায় উঠতে হ'ল। বঙ্কিমবাবুর রীতিমত একটি হাসির লেখা পড়তে শুরু করলুম। উঠতেই ফুড়ুক্ ক'রে পেছন থেকে সম্ভবত সেই মুকুজ্জে আর একটি ছোকরা পালাল। সামনের বেঞ্চে বড়বাবু ব'সে দু-একটি বৃদ্ধকে ডাকতে লাগলেন, তোমরা এগিয়ে এগিয়ে ব'স না হে! নেহাত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু'জন তাঁর ডাকে সাড়া দিলে, বাকি সবাই পেছনেই বসে রইল। প্রত্যেকের মুখে হাসির ভাব চুলোয় যাক, জীবনে যে তারা কোনদিন হেসেছে তা বোঝবার জো নেই। মনে হ'ল, সদ্য যেন কোন আত্মীয়কে শ্মশান-ঘাটে নিয়ে এসে বেচারীরা উদাস ভাবে সামনের দিকে চেয়ে জীবনের অসারতা যে কতখানি তা উপলব্ধি ক'রে চলেছে।

আমি ত প্রাণপণে হাসির লেখায় যতটা রস ঢালা সম্ভব তাই ঢেলে বঙ্কিমবাবুর রচনা পড়তে শুরু করলুম।

আমার সাহিত্যিক বন্ধুটি জোর ক'রে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে হাসতে লাগলেন, সভাপতি ও অন্যান্য সাহিত্যিকদের মুখেও হাসি দেখা দিলে; কিন্তু যাঁদের জন্যে কমিক, তাঁরা তখন সাড়ে চারটের ট্রেনের কথাই যে কাতর ভাবে ভাবছেন তা মুখ দেখে বুঝতে পারলুম।

প্রাণ যায়। বড়বাবু দু-একবার হো-হো ক'রে হেসে পেছন ফিরে ফিরে দেখতে লাগলেন, অপরেও হাসছে কি না! নেহাত বড়বাবুর দিকে চেয়েই দু-চারজন একটু অপ্রস্তুতের

হাসি হাসলে, কিন্তু সে সকরুণ হাসি না হাসলেই পাঠক হিসেবে আমি খুশি হতুম। শেষকালে আমি উপায়ান্তর না দেখে সত্যি সত্যি কমিক শুরু ক'রে দিলুম। নেচে, কুঁদে, মুখ ভেংচে এমন কাণ্ড আরম্ভ করলুম যে, মানুষ যাতে আমাকে পাগল ভেবে ও

খানিকটা হাসে—এই সঙ্কল্প আর কি! তাতে দেখা গেল লোকে পরস্পরের মুখ-চাওয়াচায়ি করছে অর্থাৎ হাসা উচিত কি না ভাবছে।

অবশেষে সর্বাঙ্গ সিক্ত ক'রে ঘর্মাক্ত কলেবরে যখন বসলুম, তখন বড়বাবুর হাততালিটাই সবচেয়ে প্রধান হয়ে উঠল। আমার অনুষ্ঠানের পরই বক্তৃতা। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভার বিশ্লেষণ করতে এক বক্তা উঠলেন। তিনি পঁচিশ মিনিট ধ'রে বক্তৃতা দেবার পর দেখা গেল, জন দশেক পেছনের আসনে সমাসীন। একজন বৃদ্ধ বেশ তোফা নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন, তাঁর নাক ডাকা শুনে বড়বাবু কাছে গিয়ে মারলেন এক ধাক্কা, তার ফলে দেখা গেল অন্যান্য লোকগুলো বেশ খুশি মনে হেসে উঠল, এবং সেই বক্তাটির সিরিয়াস বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে চতুর্দিক থেকে সেই বৃদ্ধের অবস্থা ও ভাব

দেখে কুঁক্-কুঁক্ ক'রে একটা চাপা হাসির আওয়াজ বেরুতে লাগল।

সভাপতি মশাই যখন উঠলেন, তখন সবশুদ্ধ তিনজন দর্শক আছেন। তিনি ব্যাপার দেখে মিনিট খানেকের মধ্যে তার বক্তব্য শেষ করলেন, পরিশেষে উঠলেন বড়বাবু ধন্যবাদ দিতে।

বড়বাবু বললেন, এই আপিসে গত পনেরো বছর ধ'রে সাহিত্য-সভার সৃষ্টি হয়েছে এবং কেরানীরাও যে সাহিত্যরসিক হতে পারেন তা তাঁরা প্রমাণ করেছেন। তাঁরা এগারো বার বঙ্কিম-স্মৃতিবার্ষিকী, ন বার রবীন্দ্র-জন্মোৎসব, পাঁচ বার নেতাজী উৎসব করেছেন এবং অদম্য উৎসাহে সাহিত্য-প্রচারের জন্যে চেষ্টা ক'রে যাচ্ছেন: কিন্তু দুঃখের বিষয়, আধুনিক কালের লোকেদের কাছ থেকে সে রকম সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না সব সময়, তবু তাঁদের চেষ্টার ত্রুটি নেই।

বড়বাবুর স্বর চড়তে লাগল, জাত-কেরানীর দলের দ্বারা কখনও সাহিত্যসেবা হতে পারে না, বাঁদরগুলোকে বলে বুঝিয়ে কিছুতেই কিছু করতে পারি নি, বঙ্কিমবাবুর কাজ যেন হতভাগাগুলো আমার বাবার কাজ বলে মনে করে।

ইতিমধ্যে আপিসের যত চাপরাসী বড়বাবুর চীৎকারে ভেতরে ঢুকে পড়েছে, বড়বাবু তাদের দেখে আরও চীৎকার ক'রে বলতে শুরু করলেন, আপনারা স্বচক্ষে দেখলেন কি ভাবে আমি লোক যোগাড় করেছি। কিন্তু একা কতদিক

সামলাব বলুন ? বাংলা সাহিত্য এর পরে থাকবে না বুঝতে পাচ্ছি—আপনারা যে কেন বৃথা মাথা ঘামিয়ে মরছেন তাও বুঝি না, সকালে বাজারে গিয়ে আলু-পটল বেচলে দু' পয়সা পাবেন। এ সব ছেড়ে দিন।

চড়্‌চড়্‌ ক'রে এই সময় কয়েক জন হাততালি দিতে চাপরাসীরাও হাততালি দিয়ে উঠল এবং বড়বাবু তাতে আরও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তিনি আরও চীৎকার ক'রে হাত নেড়ে বলতে লাগলেন, বঙ্কিমবাবু আজ যদি বেঁচে থাকতেন তাহ'লে বুঝতেন, তাঁর স্থান আজ কোথায়! তাঁর বই সিনেমায় দেখে নি এমন লোক পাবেন না। আজ তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তাহ'লে হিন্দী ফিলিম্‌ কিছুতেই এত টাকা নিয়ে যেতে পারত না। তাঁর মৃত্যুতে যে দেশের কত বড় ক্ষতি হয়েছে তা এখন বুঝতে পাচ্ছি। যাঁরা কষ্ট ক'রে আজ এখানে এসেছেন তাঁদের আমি আমাদের এই আপিসের সাহিত্য-সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। বন্দে মাতরম্‌!

এর পরে কোন আপিসের সাহিত্য-সভায় আর হাসি-খুশি করতে জীবনে পদার্পণ করি নি!

নারীপ্রগতি ও পুরুষের গতি

বলি খবরের কাগজটা নিয়মিত পড়েন? সেদিন পড়েছিলেন খবরটা? এক ব্যক্তির স্ত্রী তাঁর প্রাণনাথকে আচ্ছা ক'রে পেটনচণ্ডী দেওয়ার ফলে তিনি পনেরো দিন বিছানায় কুপোকাৎ হয়েছিলেন, তারপর পথ্যি পেয়ে গায়ে একটু গত্তি লাগতেই ভদ্রলোক আদালতে স্ত্রীর বিরুদ্ধে মারপিটের নালিশ ঠোকেন—ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব (অনেকে হয়তো বলবেন পুরুষ কি-না) স্ত্রীর বিরুদ্ধে রায় দিয়ে, পনেরো টাকা জরিমানা ক'রে ছেড়ে দিয়েছেন, জরিমানা অনাদায়ে স্ত্রীকে সাতদিন কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। বিবাহিত জীবনের কি সুখের পরিণতি! এঁদের নাকি পঁচিশ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল।

এতদিনে বোধ করি প্রেমের জয়ন্তী হ'ল। ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের একটা কপি যদি ঘরে ছবির ফ্রেমে উভয়ে টাঙিয়ে

রাখেন তাহ'লে সেটা প্রেমের স্মরণিকা হয়ে চিরদিন থেকে যাবে।

ওঃ! কী সাংঘাতিক ব্যাপার ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে বুঝুন!

মানে, যত দিন যাচ্ছে তত বুদ্ধিশুদ্ধি ঘুলিয়ে আসছে, আর কেবল ভাবছি যে তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকলো কিন্তু অভিজ্ঞতা লাভ করলুম কচু! শাস্ত্রে যা লিখেছে তা কি মিথ্যে? স্ত্রীলোকের চরিত্র বোঝা সোজা কথা! আমরা ত স্ত্রীকেই বুঝি না তার আবার অপর স্ত্রীলোক —হ্যাঁঃ!

একবার ভেবে দেখুন ক্রমশঃ কিরূপ দুর্য্যোগ ঘনিয়ে আসছে। সব্বার ঘরে না হ'ক, শতকরা পঞ্চাশটা ঘরেও স্বামী বেচারারা রাস্তার লক্ষ হাঙ্গামা বাঁচিয়ে সারাদিন খেটেখুটে এসে রাত্তিরে যে বিছানাতে একটু নিশ্চিন্তে আড় হবার উপক্রম করবে তারও জো রইলো না। কারণ কখন যে কার স্ত্রী ক্ষেপে গিয়ে একটি রদ্দা ঝাড়বেন বা গালে বিরাশি সিক্কার একটি ওজন বসিয়ে দেবেন সেটা ত আগে থেকে কেউ মালুম করতে পার্চ্ছে না?

অতএব আসুন, আমরা কিঞ্চিৎ গোপনে তল্পিতল্পা গুছিয়ে রাখি, একটু ভাবগতিক খারাপ বুঝলেই একেবারে হাওড়া থেকে সোজা কন্‌খলের টিকিট কেটে সংসার ছেড়ে পিট্টান মারবো। কারণ জয়ন্তীর সময় বরাবর পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে

তাতো পূর্বাহ্নে কিছু কিছু অনুমান করতে পার্চ্ছেন? অবশ্য দেখে না শিখে যদি ঠেকে শিখতে চান তাহ'লে অপেক্ষা করুন। কিন্তু জানবেন যত পুরোণো হয়ে নড়বড় করবেন, স্ত্রীর কাছে তত খাতির কমবে।

যদি বলেন, এ অবস্থা যে হবেই তার ঠিক কি? তার উত্তরে বলবো যে, সবার ভাগ্যেই যে তাই হবে সে-কথা বলছি না—প্রত্যেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে ঠিক, কিন্তু অধিকাংশেরই হবে বলে আমার অনুমান। এর চেয়েও যে খারাপ অবস্থা হবে না তাও কি আপনারা জোর ক'রে বলতে পারেন?

হয়তো ঠেঙানিও খেতে হবে, আদালতেও যেতে হবে এবং স্ত্রীর জরিমানার টাকাটাও শেষ পর্য্যন্ত আক্কেল-সেলামী হিসেবে জমা দিয়ে আসতে হবে। দু'পক্ষের আদালতের আর উকীলের খরচ সেও হয়তো যাবে নিজের তবিল থেকে—অতএব একটু সতর্ক থাকা প্রয়োজন নয় কি?

আপনারা হয়তো বলবেন তুমি টিকিট কিনে রাখ, অত যদি ভয় হয়। বেশ মশাই, আমিই কিনবো, আমার জয়ন্তীর টাইম হয়ে এল—কিন্তু অভিজ্ঞতার বাণী যদি না শোনেন ও পরে পস্তিয়ে দয়া ক'রে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে যদি কেউ হরিদ্বারে গিয়ে সেঁধোন, তখন কিন্তু আমি কাউকে ছেড়ে কথা বলবো না—এটা মনে থাকে যেন।

দিনকাল বড় সহজ নয়। মেয়েরা আর সেকালের অবলা

নয়—যে হাব্‌লা গোব্‌লা পেয়ে আপনারা তাদের ওপর যা খুশী ক'রে যাবেন, এখন ইচ্ছে করলে তাঁরা আপনাদের ছালায় পুরে টালার জলের ট্যাঙ্কে ডুবিয়ে দিনের মধ্যে তিনবার নাকানি চোবানি খাইয়ে আসতে পারেন, এটা জেনে রাখবেন!

এই ত সেদিন একটি মেয়েকে দেখলুম একটি ঘুঁসিতে ট্রামে এক বুড়ো ভদ্দরলোককে কাৎ ক'রে দিলে। অবশ্য সে ভদ্রলোকেরও মরণ—বাড়ীর থেকে বোধহয় রাগারাগি ক'রে বেরিয়েছিলেন, তাই অন্যমনস্কভাবে

বসবি ত বস, এক লেডীর পাশেই থপ্‌ ক'রে বসে পড়েছেন! আর যায় কোথা? টপ্‌ করে উঠে পড়বার আগেই, খপ্‌ ক'রে তাঁর কামিজের গলা ধরে, এক কুমারী বসিয়ে দিলেন তাঁর দেড়ে গালে এক থাপ্পড়। ছুশোবার মাপ চেয়েও রেহাই নেই—ট্রাম ভর্তি লোক একেবারে থ! এরকম অন্যমনস্ক হওয়াটা অবশ্য খুবই গর্হিত বুঝি। কিন্তু মেয়েরা যদি একটু না-ভেবেচিন্তে এই ভাবে হাত চালান তাহ'লে ত গেছি! দেখে বুঝলুম মা-লক্ষ্মীর কব্জির জোর আছে। আচ্ছা ভাবুন

—এই মহিলার যিনি স্বামীত্বের সৌভাগ্য লাভ করবেন তাঁকে ত ফুলশয্যের রাত্তিরেই আমসত্বে পরিণত হতে হবে। প্রত্যহ একশো ছাব্বিশটা ক'রে ডন বৈঠক না দিলে কি শরীরের তাকত্ ঠিক রাখতে পারবেন?

যদি বলেন, দূর্ তা কি হয়? কোন ভদ্রলোক পরিবারের সঙ্গে তা বলে ঐ রকম ঘুসোঘুসি ক'রে বাস করে না, তোমার আবার সবই বাড়ানো। তা-তো বটেই! কটা পরিবার ঠেসাঠেসি ক'রে বসে আছে প্রভু? এখন আর শ্রীচরণের দাসী কেউ নেই, গলায় ফাঁসী লাগিয়ে ঝুলে পড়ার রেওয়াজও বাসি হয়ে গেছে, এখন ঘরে ঘরে শুধু ঝাঁসির রাণীরা হৈ-হৈ ক'রে ঘোরাফেরা করছেন।

এই ত ফাল্গুন মাসে সেদিন আমাদের পাড়ার কেঁচো দত্তর বাড়ীতে বৌমা এল, ডবল এম, এ—ফুলশয্যের দিনে সে কী কেলেঙ্কারী! ছেলে মাঝরাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন—আধখানা কাণ ঝুলছে। ব্যাপার কি?—না, বৌমা দাঁত দিয়ে একখাবলা মাংস উঠিয়ে নিয়েছেন। যারা আড়ি পেতে খাটের তলায় লুকিয়ে ছিল তারা বরের কোকিয়ে কান্না শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে তাকে টেনে আনে তাই রক্ষে, তা-নাহ'লে বাকীটুকুও বোধহয় থাকতো না। সংবাদ পাওয়া গেল দু'জনে নারী পুরুষের অধিকার নিয়ে তর্ক করতে করতে দ্বিমত হওয়ায় এই কাণ্ডটি ঘটেছে।

তার পরদিনই কেঁচো গালে হাত দিয়ে আমার বৈঠকখানায়

এসে হাজির, চুপি চুপি পরামর্শ নিতে যে, বৌমায়ের সম্পর্কে কি করা যায়।

আচ্ছা, আমি এর কী পরামর্শ দেব, বলুন ত? আমি সব শুনে তখনকার মত বৌমার দিকে টেনে, তাকেই খিচিয়ে বলে উঠলুম, বেশ হয়েছে, তোমার গঙ্গারাম ছেলের উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে, তুমি আর কথা বোলো না। ফুলশয্যের দিনে বেটাচ্ছেলের আর পাঁচটা এধার-ওধারের ভালমন্দ কথা জুটলো না, প্রথম দর্শনেই বৌমার সঙ্গে ডিবেটিং কম্পিটিশন লাগিয়ে দিলে?—ও ঠিকই করেছে!

অবশ্য মুখে ত ও-কথা বললুম কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে বুকটা ঢিপ্ ক'রে উঠলো। আমাদের সময় যাহ'ক তাপ্পি-তুপ্পি দিয়ে কেটে গেল। কিন্তু ভবিষ্যত?—অন্ধকার!

হে কুমারগণ! তোমাদের বরাতে কি মার আছে তা তোমরা একটু বুঝে সুঝে দেখে নিও। কানের দুল আর বাহার করা চুল দেখে বেভ্যুল হয়েই ফুলের (Fool) মত ঝুলে পড়ো না। শাড়ী দেখে বাড়ী গিয়ে রাত জেগে যত পার কবিতা লিখে মাসিক পত্রে ছেপো। কিন্তু দোহাই, এক হাঁড়িতে ভাত চাপাবার আগে একটু হাত ধরে ওঁদের নাড়ী পরীক্ষা ক'রে নিও! নইলে মজবে!

আমি জানি মেয়েরা আমার উপর চট্ছেন। কিন্তু জীবনে কোনদিন যদি একজনও একটু সুচক্ষে দেখতেন তাহ'লে অন্ততঃ তিনখানা রসের উপন্যাস লিখে ফেলতে পারতুম। কিন্তু

বরাত এমনি যে, আমাকে দেখলেই তাঁরা জ্বলে যান, তাই অনেক দুঃখে কথাগুলি বলছি। আপনারা হয়তো ভাবছেন যে, বাড়ীতে বোধহয় আমার, ঘাড়েও দু-এক ঘা পড়ে, তা না হ'লে এত দুঃখু কেন? কিন্তু বিধাতা ঐটে একটু সুবিধে ক'রে দিয়েছিলেন যে, এ জন্মটা দাঁত-খিঁচুনির ওপর দিয়েই কেটে গেল—তবে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা বলতে পারি না ভেবেই রেলের টিকিট কেনার কথাটা তুলেছিলুম।

আজকের দিনে পুরুষদের রক্ষা সমিতি দরকার হয়েছে বলেই বিষয়টি আলোচনা করা আবশ্যক। অবশ্য দোষ পুরুষদের অনেকের আছে জানি—নারীদের ওপর কম অত্যাচার করেনি, কিন্তু অধিকাংশ গেরস্ত চিরদিন এঁদের কাছে তটস্থ না হয়ে থাকলে সুস্থ দেহে তাঁরা সংসার করতে পারতেন কি? বাড়ী, হাঁড়ি সবই ত ওঁদের জিম্মায়—মায় টাকাকড়ি পর্যন্ত, কিন্তু ওঁরা যে কোনদিন গাড়ীতে উঠে এক থাপ্পড়ে লোকের দাঁতের মাড়ী ফুলিয়ে দেবেন, এ-কি আগেকার দিনে কল্পনা করা যেত?

সেকালের ও একালের মেয়েদের মধ্যে পরিবর্তন হতে হতে এমন দাঁড়িয়েছে যে, প্রায় ডাক্তার ডাকিয়ে নারী পুরুষের ভেদাভেদ না চেনালে আর কিছু ঠাওর করার উপায় নেই গোছের হয়ে এল। এটা কি? অবশ্য জগতে পরিবর্তন স্বাভাবিক কিন্তু দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে যদি নারীরা পাঁই পাঁই ক'রে ছুটতে থাকেন, তাহ'লে তাঁদের নিয়ে আমরা করি কি?

ভাবছেন হয় ত আমি একটা সেকেলে গোঁড়া, মেয়েরা চিরকাল বাড়ীতে খোঁড়া হয়ে বসে থাকলেই বোধহয় আমার মনস্কামনা পূর্ণ হত। কিন্তু এটা আপনাদের ভুল ধারণা। আমি মোটেই মেয়েদের প্রগতির বিরোধী নই বরং বিশেষ পক্ষপাতী—তাঁরা এরোপ্লেনের গতি পেলে আরও খুশী হই, যেহেতু ঊর্ধ্বে উঠে দেবীরা আমাদের নাগাল না-পেলে সংসারের অনেক দুর্গতির হাত থেকে আমরা কিছু দিন অন্ততঃ রেহাই পেতুম। কিন্তু তা-ত হবে না—তাঁরা এখন দাঁড়ি পাল্লায় উঠে একেবারে পুরুষদের সমান ওজন চান—সেইজন্যেই ত এত ভাবনা! হয় তাঁরা ওপরে উঠুন, নয় নীচে থাকুন. তা নাহ'লে আমরা যে কোন তাল পাই না। বিধাতা তাঁদের দেহের ওজন এমনিই ত আমাদের চেয়ে ভারী ক'রে পাঠিয়েছেন, এর বেশী আর কী তাঁরা চান? আইন ক'রে, সিগারেট খেয়ে, পার্টিতে নেচে, এমন কি কোট প্যাণ্টুলুন পরলেও ত আসলে যে নারী সেই নারীই থাকবেন —তার ত আর বদল হবে না—তবে? সমান হয়ে থাকবার জন্যে এত মারপিট কেন?

যদি বলেন, এ সব পুরুষদের অতীতের অবিচারের দরুন প্রায়শ্চিত্ত—ভাল কথা। কিন্তু নিত্যি যে-সমস্ত চিত্ত বিভ্রম-কারী ঘটনা তাঁরা ঘটাচ্ছেন তাতে যে প্রাণ আঁৎকে উঠছে। একটু রয়ে সয়ে করুন। একে সংসারের চাপে এমনিতেই বুক ধড়্‌ফড়্ করছে তার ওপর যদি ফড়্ ফড়্ করেন, তাহ'লে

ত আর তাঁদের সঙ্গে ঘর করা যায় না। নারীরা শান্তির বারি, তাই কান্তিময়ীরা যদি গোপনে অন্তর টিপুনী দিয়েই ক্ষান্তি দেন তাহ'লেই নিজেদের ভুল ভ্রান্তি চুপিচাপি শুধরে নিতে পারি। কিন্তু তার বদলে প্রগতির নামে শ্রীমতীরা যদি ঘুসি পাকিয়ে প্রকাশ্যে যা-খুঁসী করতে স্বুরু করেন, তাহ'লে গঙ্গার ধারে কোশাকুশি নিয়ে আমাদের ধ্যানমগ্ন হওয়া ছাড়া আর কোন গতি আছে কি ?

নাটকের চটক

সম্প্রতি আমার একটা সর্বনাশের খবর পেয়েছিলেন কি?

পাননি! তা পাবেন কি ক'রে, নিজেরটি ছাড়া আর কারুর কোন খোঁজ কখনও রাখেন, না আর কোন লোকের দিকে (অবশ্য স্ত্রীলোক ছাড়া) কখনও মুখ তুলে চান? চাইলে আমার ব্যাপারটা আর চোখ এড়াতো না। কটা দিন আমার খুব ঘটা ক'রে কাটলো কিনা, তাই বলছি। অপর লোক হলে চটা উঠে যেত কিন্তু আমি নেহাৎ ইস্পাতে গড়া বলে ঠিক খোঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। আপনাদের সেই পাঁচুবাবু আমায় একেবারে পাগল ক'রে মেরেছিলেন।

মশাই, কে জানতো যে পাঁচুবাবু নাটক লেখেন, চিরকালই ত তাঁকে ব্যবসা করতে দেখেছি কিন্তু তিনি যে আবার বে-হিসেবীর মত কোন্ ফাঁকে টক্‌টক্ ক'রে একটা নাটক লিখে ফেললেন

তাতো জানি না—সেদিন রাত্তির সাড়ে আটটার পর একটা প্রকাণ্ড জাবদা খাতা নিয়ে বাড়ীর দরজায় ঠক্‌ঠক্ ক'রে আওয়াজ শোনার পর নীচে নেমে সব টের পেলুম।

আমার ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস—এ নাটক নাকি আমিই ইচ্ছে করলে স্টেজে প্লে করিয়ে দিতে পারি। যেহেতু আমার সঙ্গে থিয়েটারের লোকদের একটু আলাপ পরিচয় আছে সেই হেতু আমি তাঁদের কাছে বইটি পৌঁছে দিলেই নাকি পরের শনি-রবিবার থেকে দেওয়ালে প্ল্যাকার্ড পড়ে যাবে।

যত বলি মশাই, আমার সঙ্গে থিয়েটারের দু-তিনজন কাটা সৈন্য ছাড়া আর কারুর সঙ্গে জান-পছান নেই, আপনি নিজে চেষ্টা ক'রে দেখুন—তিনি ছাড়বেন না। সকাল বিকেল অতিষ্ঠ ক'রে মারলেন।

ছুটির দিনে দুপুরে কোথায় একটু আড় হব তার জো নেই, তিনি নাটক শোনাতে এলেন। নাটকটিতে গোটা বারো অঙ্ক আছে, তিনদিন এক নাগাড়ে প্লে করা চলে। তাছাড়া বৈচিত্রের অন্ত নেই। একুশবার সখীদের নাচ আছে, উনিশটা হত্যাকাণ্ড আছে, চল্লিশবার কামান দাগা আছে, সতেরোটা প্রেমের দৃশ্য আছে, গোটা এগারো সাহেব চরিত্র আছে, দু'টো ঝড় বৃষ্টির সিন আছে, বারো জায়গায় সব আশ্চর্য আশ্চর্য ঐন্দ্রজালিক দৃশ্য পরিবর্তনের সুযোগ আছে—যথা নায়ক আম খেতে গাছে উঠলো, সেটায় হাত

দিতেই মর্তমান কলায় পরিণত হয়ে গেল, নায়িকাকে জড়িয়ে ধরতে গেল হঠাৎ নায়িকা তার ভাবী গুঁফো শ্বশুরে পরিবর্তিত হয়ে বসে রইলো—যাকে বলে কেলেঙ্কারী ব্যাপার আর কি! তাছাড়া ভক্তি, প্রেম, হতাশা, শয়তানি, ঘেন্‌ঘেনানি, টানাটানি কি যে তাতে নেই তা বলা শক্ত। এটা ঠিক বাংলাদেশের সবাইকে খুশী করবার মত প্লট্‌।

মানে, সেই বৈদিক যুগ থেকে সুরু ক'রে জয় হিন্দ্‌ পর্যন্ত কিছু বাকী নেই। মনে করুন, এক একজনের স্বগতোক্তি বলতে গেলে এ্যাকটারদের কতখানি দম আছে তা ধরা পড়ে যাবে। এই ভীষণ, হাস্যকরুণ, লোমহর্ষণ মিশ্রিত নাটকের অভিনয় করা যার তার কর্ম নয়—বেশ বোঝা গেল।

মশাই, তাগাদার চোটে অস্থির হয়ে থিয়েটারের এক বাবুকে ধরলুম, তিনি বছর তিরিশ ধরে দূত সাজছেন, দশ-টাকা মাইনে পান, কামাই নেই কিন্তু যথা সময়ে মাইনে হাতে আসেনা। তিনিও কিছু বলেন না—তাই থিয়েটার প্রোপ্রাইটারদের কাছে খুব সৎলোক বলে খ্যাতি আছে। অগতির গতি তাঁরই ভরসায় দুরু দুরু হৃদয়ে থিয়েটারে গেলাম। জীবনে মনে করুন, একটাকার বেশী টিকিট কিনে ছারপোকা মার্কা চেয়ারে বসা ছাড়া থিয়েটারের অন্দর মহলের কিছু দেখিনি—আজ দূত মহাশয়ের কল্যাণে একেবারে খোদ মালিকদের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সঙ্গে পাঁচুবাবু ত জাবদা খাতা নিয়ে আছেনই।

দেখলুম থিয়েটারের হয়ে এসেচে—দু'দিন পরেই সিনেমা হবে এখানে। প্রোপ্রাইটারবাবুরা গদী-আঁটা চেয়ার ছেড়ে টিক্ উডের ভাড়া-করা চেয়ারে বসে আছেন—কারুর কারুর গালে হাত দিয়ে বসে থাকা দেখেই বুঝলুম বোধ-হয় এঁরা হালে পানি পাচ্ছেন না। এমন সময় আমাদের

প্রবেশ। একটি ভদ্রলোক কি খাতায় হিসেব লিখছিলেন, তিনি ত আমাদের না দেখেই বলে উঠলেন,—বলে দিয়েছি ত আজ হবে না, আবার কেন ধন্না দিচ্ছেন—রবিবারের আগে দু'টো টাকাও দিতে পারবো না—যান্।

বুঝলুম ভদ্রলোক বোধহয় আমাদের কাটা-সৈন্যদলের তাগিদদার ভেবেছেন, তাই গলাটা একটু খাঁকরি দিয়ে বলে উঠলুম,—আজ্ঞে টাকা, হুঁঃ, কি বলছেন মানে ঠিক—

কথা শেষ হবার আগেই তিনি চোখ তুলে ভাগ্যি দেখলেন আমরা অন্যলোক, তাই রক্ষে, না হলে বোধহয় যাচ্ছেতাই করতেন। দু' মিনিট আগে যে-সব ভদ্র-সন্তানরা ভারত সাম্রাজ্য শাসন না করুক মেজর জেনারেলের পোস্টে থেকে

স্টেজ চ'ষে এল তাদের ওপর তম্বি ক'রে ক'রে বুঝলুম এঁর মুখটা ব'লে গেছে—এখন তাই পরিচিত অপরিচিত—সকলেরই বাপান্ত ক'রে ছাড়ছেন। পরে শুনলুম তিনি ম্যানেজার।

যাই হ'ক, দূত মহাশয় নাট্যকার সম্বন্ধে আগে থেকেই অদ্ভুত পরিচয় দিয়ে রাখতে চট্ ক'রে আলাপটা হয়ে গেল। নাট্যকার একটু রেস্তদার লোক হওয়াতে বোঝা গেল অধিকারীরা খুব খুশী, তাছাড়া বই পত্তরও হাতে নেই উপরন্তু পাঁচুবাবু আবার বইয়ের জন্যে কিছু খরচা দিতে রাজী আছেন শুনে তাঁরা ত তক্ষুনি তিনকাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে দিলেন। কী খাতির!

মিনিট দশেক পরেই দোকানের হাতলভাঙা নীল পাড়-ওয়ালা তিনকাপ সুক্তো, একচুমুক খেয়েই বোঝা গেল যে, থিয়েটার শুধু জোর চলছে না, এখানকার চায়ের দোকানও সমতালে মার্চ করতে করতে চলেছে। পাঁচুবাবুর বইখানি হাতে নিয়ে অধিকারীদের একজন তক্ষুনি বলে ফেললেন,—বইয়ের ওজন দেখেই মনে হচ্ছে, বইখানি ভারে কাটবে।

পাঁচুবাবুর মুখে কী হাসি! তারপরই নাটকের প্রযোজনা বাবদ স্ফূর্তির সঙ্গে পাঁচুবাবু হাজার টাকার আগাম এক-খানি চেক কেটে বসে রইলেন। যেন আসছে শনিবারই নাটকের উদ্বোধন রজনী ঘোষণা করা হবে। আসল নাটক কিন্তু সুরু হল এরপর থেকেই। ম্যানেজার মশাই একগাল হেসে সেদিনকার চলতি নাটকটা দেখে যাবার জন্য

এমন মিনতি জানালেন যে তা উপেক্ষা করা শক্ত হয়ে উঠলো।

আমাদের তখুনি খাতির ক'রে একটি কুশন বক্সে একজন বসিয়ে দিয়ে গেলেন। চিরকাল নীচে কেঠো হাতল ও শিরদাঁড়াবিহীন ছারপোকা মার্কা চেয়ারে বসে বসে ভেবেছি যে, দোতলার ঐ আসনে উপবিষ্ট লোকগুলির চেয়ে সুখী বোধহয় আর পৃথিবীতে কেউ নেই, কিন্তু আজ সেইখানে সীট্ পেয়ে শরীর সিঁটিয়ে উঠলো।

বক্সের গদীতে কাপড় নেই, নারকেল ছোবড়াগুলো ছারপোকার চেয়ে অধিকতর সূক্ষ্মভাবে পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করতে সুরু করলো। ভাবলুম জুতো শুদ্ধু নয় উবু হয়ে বসে থাকি কিন্তু আমাদের উস্খুস্ ভাব দেখেই বোধহয় দয়া-পরবশ হয়ে একজন গার্ড ছ'সাতখানা খবরের কাগজ নিয়ে ছুটে এসে তু-পুরু ক'রে গদীর ওপর বিছিয়ে দিলেন। আমি বললুম্—ফ্যানটা খুলে দিন, এবার তিনি তু'খানা হাতপাখা দিয়ে গেলেন।

তখন মাথার ওপর চেয়ে দেখি ফ্যান নেই, একেবারে শূন্য। পরে শুনলুম ফ্যান ভাড়া দেনেওয়ালার টাকা বাকী পড়ায় সে আটাশখানা ফ্যান খুলে নিয়ে গেছে। প্রেক্ষাগৃহে শ'খানেক আন্দাজ লোক বসে বসে হাই তুলছে—পেছন প্রায় খালি, সামনে জন পঁচাত্তর লোক বসে আছে—নিশ্চয় পাসে। সাদা আলোগুলো সখীদের পায়ের নাচের ধূলো খেয়ে খেয়ে

জনডিসে ভুগছে, স্টেজের চতুর্দিকে মাকড়সার জালের ছাউনি। সামনের ড্রপটার দড়ি ঝুলে পড়েছে, এখন যে একেবারে খুলে পড়ে যায়নি কেন, এই পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য! তার আর কিছু পদার্থ নেই—নব্বই বছরের বুড়োর চামড়ার মত ঝুলছে। পানবিড়ি সিগারেটরাই আসর জাগিয়ে রেখেছে, নইলে সব চুপ!

কিন্তু প্লে আরম্ভ হবার কথা ৬টায় ওদিকে ৭টা বাজে, তবু ড্রপ ওঠে না কেন? শুনলুম হিরো সবেমাত্র এসে পৌঁচেছেন, তাঁর স্যুটিং ছিল। আরও আধঘণ্টা কেটে গেল, শুনলুম হিরো তৈরী কিন্তু হিরোয়িনের এখনও মেক্-আপ ঠিক হয়নি। তিনি নাকি যতবার রং চাপাচ্ছেন ততবারই তাঁকে দেখতে আরও কুচ্ছিৎ হচ্ছে—থিয়েটারের লোকে বলছে যে, বাহার দেখে তাঁদেরই তাঁকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে কিন্তু তিনি তাতেও খুশী নন, কেবল ভাবছেন ওরা ত বলবেই। অডিয়েন্সরা ওখান থেকে লাফ্ মেরে তাঁকে ধরতে আসে তবে ত! তাঁর প্রতিজ্ঞা—অপ্সরা না সেজে তিনি আর বেরুবেন না, অথচ তাঁর পার্ট, রাস্তার সর্বহারা এক ভিখারিনীর।

যাক্ মশাই, আটটা আন্দাজ ত ড্রপ উঠলো কিন্তু যে দৃশ্য চোখের সামনে ফুটে উঠলো সে দেখা যায় না। পঁয়ষট্টি থেকে পঁচাত্তর বছর আন্দাজী বয়সের গুটি পনেরো সখী বেরুলেন। এদিকে পোঁটলা-পুঁটলি দিয়ে দেহের বাঁধুনি ঠিক রেখেছেন বটে কিন্তু ঢোকা গাল দিয়ে যখন আলতার

লাল ফুটে বেরুচ্ছে দেখলুম—তখনই সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল। বুঝলুম পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকায় এর চেয়ে ভাল আর কি জুটবে। আর ভাল আনলেও ত নিস্তার নেই, অমনি ভুঁড়িওয়ালাবাবুরা তার পর দিনই ভালবেসে তাঁদের পাঁচশো টাকা দাদন দিয়ে একান্ত আপন ক'রে নেবেন ত—তাই আমাদের দুধের সাধ ঘোলেই মেটাতে হবে বৈকি!

প্রথম অঙ্ক কোনক্রমে শেষ হতে দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হল আরও ঘণ্টাখানেক বাদে। প্লট্‌টা প্রায় ভুলে যাওয়ার সময় বরাবর ঘণ্টা বেজে উঠলো, ওদিকে সাড়ে দশটায় ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে আর বসে থাকতেও পারলুম না, উঠে গেলুম। পাঁচুবাবুর নাটক এখানে ঠিকই জমবে বলে আমার ধারণা হতে বিলম্ব হল না। সত্যি, নাটকটি মহলাতেও পড়লো।

মহলার সময় কর্তারা বললেন,—দেখুন বইটা বড়, দু'ভাগ ক'রে নিলে হয় না? পাঁচুবাবু বললেন,—আলবৎ! আমি ভাগ ক'রে দিচ্ছি—একটা অপেরা, একটা ড্রামা ত হবেই, আমি সেইভাবেই লিখেছি কিনা। মহলা চলেছে দ্রুত কিন্তু দূত আর প্রহরীরা ছাড়া অন্য কেউ নেই—বড়রা নাকি শেষ মহলায় আসবেন, তাঁদের নানান কাজ বাইরে—ওদিকে পাঁচুবাবু চেক কেটে চলেছেন।

হিরোয়িনের মহলা দিতে এলে মাথা ধরে, তাই প্রোপ্রাইটাররাই তাঁর বাড়ীতে গিয়ে মহলা দিয়ে আসেন। অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের কথা বলবার উপায় নেই—তাঁরা বেশী

পয়সা নেবেন, পরিশ্রম করবেন না, অথচ চোখ রাঙাবেন সবাইকে। প্রোপ্রাইটারও বলিদানের পাঁটার মত সামনে থাকবেন, আর আড়ালে তাঁদের বাপান্ত করবেন। আমি ত সব দেখে শুনে নিরুৎসাহ হয়ে পড়লুম কিন্তু নাট্যকার ও প্রোপ্রাইটারদের আশা ও বিশ্বাস অগাধ। তাঁদের ধারণা প্রত্যেক দর্শককে এত যন্ত্রণা দিয়েও যখন কণামাত্র বিচলিত করা যায়নি তখন ভাবনার কিছু নেই—নাটক হলেই ঠিক ঘুরঘুর্ ক'রে আসবেই।

যাই হ'ক, তারিখ এল খোলবার কিন্তু অভিনয়ের দিনে আর এক ফ্যাসাদ, ড্রপ্ ওঠে না। কারণ, হিরোয়িনের জামা দেহে আঁটছে না, অবিলম্বে পঁচিশ টাকা দিতে হবে, দরজি বসে আছে।

আমি বললুম, সে কি মশাই, আগে যে রিহার্সেলের সময় মাপ নিয়ে গেল দরজি। ম্যানেজার দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, জীবনে কটা হিরোয়িন দেখেছেন মশাই, রিহার্সেলের সময় যে-মাপ থাকে প্লে-র সময় তাদের সেই মাপ কোন কালে থাকে নাকি?

বুঝলুম তাও ঠিক—সিনেমাতেও ঐ রকম দেখেছি বটে। প্রথম-ছবিতে 'ক্লোজ আপ' নিলেও মনে হত চতুর্দিকে অনেকখানটা জায়গা খালি রয়েছে, কিন্তু তার দু'খানা ছবি বাদেই দেখি লং শটেই স্ক্রীন জুড়ে তিনি একাই জগন্মাতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চুপ ক'রে গেলুম।

ইতিমধ্যে পাঁচুবাবুর পাঁচ হাজার গলে গেছে, এখন হিরোয়িনের জামার হাতা গলছে না বলে কি প্লে আটকে যাবে? তিনি গোটা পঁচিশ টাকা নগদ দিয়ে দিলেন। ঘণ্টাখানেক বাদে ড্রপ্ উঠলো।

অভিনয় সুরু হতে দেখা গেল যে, অভিনেতা অভিনেত্রীরা একটা কথাও বলছেন না, নেপথ্য থেকে প্রম্পটার সর্বাগ্রে সব বলে দিয়ে যাচ্ছে—মাঝে উৎসাহের চোটে সে একবার স্টেজের ভেতরেই বই হাতে ঢুকে পড়লো। ভাগ্যি সিংহাসনের পাশে এক সেনাপতি দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি কোষবদ্ধ তরবারির পেছনটা একটু তুলে কায়দা ক'রে তাঁর পেটে খোঁজ মেরে স্টেজের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। লোকের তাতে কী হাসি।

ম্যানেজার আমাদের পাশেই বসেছিলেন, একগাল হেসে বলে উঠলেন, ফাঁস্ট´নাইট কিনা, ওরকম ত হবেই, বুঝছেন না? দেখলুম পাঁচুবাবুও ঘামছেন। যাক্, আরও কি দুর্ঘটনা হয় তাই দেখবার জন্যে দুরু-দুরু হৃদয়ে বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ পেছনে চীৎকার, প্রম্পটার আস্তে! ব্যস! প্রম্পটার একেবারে দমে গিয়ে গলার স্বর যেমনি অভাবিতরূপে নামিয়েছে, অমনি সমস্ত অভিনেতারা তোৎলাতে আরম্ভ করলেন, হিরো হিরোয়িনেরই অর্দ্ধেক কথা বলে গেলেন, হিরোয়িন প্রথম দৃশ্যেই দ্বিতীয় অঙ্কের ডায়লগ্ বলে চলে গেলেন—মানে একবর্ণ কারুর মুখস্ত নেই বোঝা গেল।

ম্যানেজার হেসে গড়াগড়ি—ফার্স্ট নাইট কিনা—বুঝছেন না ?

আমরা তখন হাড়ে হাড়ে বুঝছি যে ব্যাপার কি হবে কিন্তু বিশ্বাস আছে এই যে, একুশবার সখীর নাচ আর সাঁইত্রিশবার কামান দাগাতেও যদি নাটক না জমে, তাহ'লে আর এদেশের নাট্যমঞ্চে করবার কিছু নেই।

ইতিমধ্যে রাজা যখন হিরোয়িনকে বন্দী করবার হুকুম দিচ্ছেন, তখন প্রহরীরা কি করবে ঠিক না করতে পেরে তাঁকেই পাঁজাকোলা ক'রে স্টেজের মধ্যে ধরে নিয়ে গেল। তখন কী হাততালি আর চীৎকার! ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ। চতুর্দিকে হৈ-হৈ কাণ্ড !

সবাই বল্লে, হ্যাঁ, এইবার একটা সাম্যবাদী নাটক প্লে হচ্ছে বটে !

আনন্দের চোটে সাত টাকার চেয়ারে উপবিষ্ট একটি মোটাসোটা ভদ্রলোকের চেয়ারের তলাটাই খুলে পড়ে গেল, ভাগ্যি দু'দিকে হাতল ছিল তাই তিনি আটকে গেলেন—নইলে খুনখারাপী হত।

মশাই, আশ্চর্য! এই বই দেখতে লোকের কী ভীড় ! পাঁচুবাবুও নাটক ঘুরিয়ে দিলেন। ভীড় যত বাড়ে চেয়ার-গুলোও তত জখম হয়, আর লোকের রকমসকম দেখে থিয়েটারের চরম অভিজ্ঞতা লাভ করি।

সিনেমার মার

আচ্ছা, বাঙালীর চোরা কারবারের টাকা কখনও থাকে দেখেছেন? তেমন বরাত ক'রে এ জাতের মধ্যে কেউ এসেছে বলে ত শুনিনি—যদি আপনারা শুনে বা দেখে থাকেন, তাহ'লে জানবেন জগন্নাথদেবের রথ-দর্শনের ফল পেয়েছেন।

আমার মাস্‌তুতো ভাই করঞ্জাক্ষ, যুদ্ধের বাজারে বলতে নেই—চোরা কারবার ক'রে বেশ দু'পয়সা করেছিল কিন্তু সম্প্রতি সেগুলো ত হুড়হুড় ক'রে বেরিয়ে গেলই, উপরন্তু করঞ্জাক্ষের পৈত্রিক বাড়ী ঘর দোর যা ছিল তাও যায় যায় হয়েছে। বাবু সিনেমার ছবি করতে গেছলেন। যেহেতু শনিবার রবিবার সিনেমার দরজার সামনে লম্বা লাইন হয়ে অনেককে দাঁড়াতে দেখেছেন, সেই হেতু তাঁর ধারণা হয়ে গেল যে পর্দার ওপর তাঁর ছবি শাইন্‌ করলেই একেবারে টাকার মাইন নিয়ে তিনি বসে থাকবেন। কিন্তু এটুকু খেয়াল করেন নি যে, লাইন হচ্ছে হিন্দী ছবিতে আর বাংলা ছবি হ্যাংলার মত জুলজুল ক'রে বাইরের দিকে লোকের প্রত্যাশায় চেয়ে আছে, অথচ সেখানে লোক নেই। জোর রবিবারে ফোর্থ ক্লাস ফুল। তার মানে একশোটা লোক ঢুকলে তবে পঁচিশ টাকার টিকিট বিকোলো।

একশো একান্নবার বলেছিলুম, দেখ বাবু, জন্মের মধ্যে কর্ম্ম, একবার ভুলে বিধাতা তোমার ঝুলিতে কিছু পয়সা দিয়ে ফেলেছেন ওটা 'ফুল'এর মত খরচা ক'রে বসোনা— বাবু শুনলেন না, এখন সর্বস্ব মূলে হাবাৎ ক'রে ছাতের ট্যাঙ্কের ওপর বসে আকাশের দিকে জুলজুল ক'রে চেয়ে আছেন।

শেষ দিকে ওঁকে সামলাতে আপিস থেকে দেড়মাস আমার পাওনা ছুটি থেকে ধার নিয়ে বসে রইলুম—তাও একেবারে 'ন দেবায় ন ধর্মায়' চলে গেল। আশ্চর্য কাণ্ড মশাই—করঞ্জাক্ষের শুভ গ্রহ সরতে না সরতেই অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহগুলো যেন সংগে সংগে ছুটে এল।

দুর্বুদ্ধি! সিনেমা করবেন, অতএব বাইরে কোন খোঁজ-খবর না নিয়ে তিনি প্রথমেই সিনেমাপাড়ায় গেলেন, এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল হতে। টালিগঞ্জে ট্রাম থেকে নেমেছে, কি না নেমেছে, অমনি গোটা পঞ্চাশ ষাট ডিরেক্টর কোথায় ওৎ পেতে উবু হয়ে বসেছিল, হঠাৎ যনাৎ না নড়ে উঠতেই একজন তাল মাফিক করঞ্জাক্ষের কাণ্কো ধরে জোর একটা হেঁচকা টান মরলে আর সংগে সংগে স্টুডিওর ডাঙ্গায় উঠে বছর খানেক খাবি খেয়ে, একেবারে ঘরে খিল লাগিয়ে, পরিবারের নাক্ছবির বাহার দেখছে।

ডিরেক্টর বাবু বললেন, কিচ্ছু খরচ নেই, শুধু মুখপাতে হাজার পঞ্চাশ বার ক'রে ফেললেই, বাকি টাকাটা যোগাবার

জন্যে আর একদল লোক নাকি ধন্না দিয়ে বসে আছে—তারা অগতির গতি, বিপদের সাথী, দীনের শরণ, লোকের উপকার করাই তাঁদের কারবার, তাঁরা ডিস্ট্রিবিউটার—অতএব মহরৎ ক'রে ফেলা যাক্।

করঞ্জাক্ষ মাথা চুল্‌কে বললে, মহরৎ ব্যাপারটা কি? ডিরেক্টর বুঝে ফেললে যে। লোকটি সত্যিই মহদাশয়, কারণ আজ পর্যন্ত মহরৎ করাটাই বোঝে না, অতএব ভাবনা নেই, একে কাৎ করতে বেশী দেরী হবে না। হেসে বললে, মহরৎ বোঝেন না? ছবির আরম্ভ আর কি! তাতে কোন হাঙ্গামা নেই, যে-বইটা আরম্ভ হবে সেইটের একটা দৃশ্য কিম্বা তার হিরো হিরোয়িনকে ক্যামেরার সামনে দাঁড় করিয়ে একটু নড়াচড়া তোলা—ব্যস্, কিছু কথাও বলানো যেতে পারে—এই আর কি!

এই ব্যাপার?—তাহ'লে—পরিচালক করঞ্জাক্ষকে কথাটা শেষ না করতে দিয়েই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, আর সামান্য কিছু খরচ আছে, সিঙাড়া ও চা। কাগজের সম্পাদকদের ডেকে একটু খাওয়াতে হয়।

করঞ্জাক্ষ হেসে বললে, কেন? তা না হলে গ্যাল দেয় বুঝি?

পরিচালক হেসে বললে, আজ্ঞে তা ঠিক নয়, সেটা পরে দেয়, কিন্তু ওদের শুভেচ্ছা নিয়ে কাজ সুরু না করলে গোড়া থেকেই হয়তো যাচ্ছেতাই করবে, তাছাড়া একটা পাবলিসিটিরও ত দরকার ?

তা ত বটেই ! করঞ্জাক্ষ রাজী হয়ে গেল, কিন্তু বই কই ? ডিরেক্টর বাবু বললেন, বই সে পরে লিখিয়ে নিলেই হবে, আগে আর্টিস্টদের সংগে কন্‌ট্রাক্টগুলো ক'রে ফেলুন না। করঞ্জাক্ষকে আর ভাববার সময় দিলেন না।

তার বৈঠকখানায় পরদিন থেকেই আপিস বসে গেল, ডিরেক্টর আগাম হাজার টাকা পকেটে পুরে, গোটা পাঁচেক তারকা অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সংগে হাজার দশ পনেরো থেকে পাঁচ হাজার পর্যন্ত রফায় চুক্তি ক'রে বসে রইলেন। তারপর চা ও জলখাবার বাবদ যা বেরিয়ে গেল, তার খরচ পনেরো দিনের মধ্যেই পনেরো শো টাকা। দেখে শুনে করঞ্জাক্ষ চক্ষে করমচা দেখতে সুরু করলে।

ঢোল মহরৎ ক'রে মহরৎ সম্পন্ন হবার পরই ডাক পড়লো আমার—তখন গিয়ে আমিতো কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক্ ! এ কোথায় এলুম রে বাবা ! টাকার ট্যাঁকশাল না বসিয়ে যারা এ কারবার করতে যায় ইহলোক থেকে তাদের সরাবার সমস্ত আয়োজন এখানে করা। আহাম্মুক বধের এমন পীঠস্থান সমগ্র হিন্দুস্থানের মধ্যে আর কোথাও আছে কিনা জানি না। বলে, যারা এখনকার রথী মহারথী, তারাই অনেকে লালবাতি

জ্বালবে. কি জ্বালবে না, বলে দু'বেলা ভাবছে, সেখানে গিয়ে তুই এই হাতীর খরচ যোগাতে গিয়ে লাথি খাবি না ত কি? আমি সাতদিন পরেই বললুম, ভায়া যা গেছে গেছে কারবার গুটোও, সে বললে, আর দাদা এখন সব-কিছু আমার মুঠোর বাইরে চলে গেছে তাই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকা ছাড়া আর আমার কোন উপায় নেই। তুমি যাহ'ক সামাল দাও—আমার মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি করবো কি? ছবি যারা তোলে তাদের সামলাবো, না আর্টিস্ট সামলাবো, না গাড়া ঠিক করবো, না জলখাবার সামাল দেব, কিছুই বুঝতে পারিনা! একটা বায়নাক্কা হলে সামলানো যায়, এ একেবারে আখরোট, মনাকার কারবার এর ধাক্কা সামলাবার মত হেকমৎ সব সময় হতনা। কিন্তু মাঝপথে পালাই বা কি করে?

ডিরেক্টর বাবু এখন ত আর ফুটপাতে উবু হয়ে বসে নেই, চেয়ারে বসে সিগারেট ফুঁকছেন, তাঁর মেজাজই অন্য। আটটার সময় শুটিং করবার কথা, তিনি বারোটায় এসে সেটে বসে বই লিখবেন। তাঁর আবার হিরোয়িনকে না দেখলে ভাব জাগেনা, তিনটে ডাব খেয়ে হিরোয়িনের হাবভাব দেখে তবে তিনি হাতে কলম ধরেন।

হিরোয়িন যিনি তিনি ত বিশ্ব বিজয়িনী—লেখাপড়া নিষিদ্ধ মাংসবৎ বাল্যকালে পরিত্যাগ করলেও, তাঁর চেয়ে পণ্ডিতানি দেখা যায় না—খবরের কাগজের ছোকরারা আর্ট সম্বন্ধে বাণী নেবার জন্যে লাইন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তিনিও অবিরত

মিথ্যে কথা ও যা-তা বলে যাচ্ছেন, আর সম্পাদকরা মাথা খাটিয়ে সেগুলিকে সাজিয়ে গুজিয়ে কাগজে কাগজে বার করছেন। গাড়ী থেকে নামা সুরু ক'রে তাঁর বাড়ী যাওয়া পর্যন্ত দুরু দুরু হৃদয়ে সবাই চারধারে ঘুরছেন—এই কি ত্রুটি ঘটে বুঝি!

মশাই, অপর একটি ছবির ডিরেক্টর তাঁর মাথায় ছাতা ধরে আমাদের ঘরের হাতায় একদিন পৌঁছে দিয়ে গেলেন—কিন্তু পাছে তিনি রাগ করেন বলে আমাদের ডাইরেক্টর তাঁর পিছু পিছু একটা ছাতা কাঁধে ক'রে বরকন্দাজের মত হাজিরি দিয়ে এলেন। অর্থাৎ একটু নজর না রাখলে শুধু গজর, গজর্ করেই তিনি ক্ষান্ত হতেন না, প্রযোজকের বাপান্ত করে ছাড়তেন।

করবেন নাই বা কেন? তাঁর সতেরোটা ছবিতে কাজ, সবাই তাঁর দিকে একটু করুণা পাবার জন্যে তৃষিত নয়নে চেয়ে রয়েছে। তবে? তাঁকে সামলাতে সামলাতে প্রাণ অস্থির! বোধহয় প্রেমিকাকেও সামাল দেওয়া যায় কিন্তু এখানে তাঁর ঝাল সহ্য করা খুব কঠিন কার্য। বিধাতা তাঁকে সাজিয়ে গুজিয়ে রূপ দিয়েছেন সত্যি কিন্তু সংগে সংগে আরও এমন কতকগুলি জিনিস দিয়েছেন তাতে ছবি তুলনে-ওয়ালা-দের বড় অসুবিধে। যথা তাঁর পেট খারাপ আছে, অম্বল-শূল আছে, মাথা ধরা আছে, বাত আছে, শরীর ম্যাজ্‌ম্যাজ আছে, চোখ কর্‌কর্ আছে, গা শির্‌শির্ আছে, সর্দি আছে, জ্বর আছে, নেই শুধু কাজে গা।

তারপর তাঁর ভক্তের যা সংখ্যা আছে তাতে তিনি যে-কোন

লোককে লবডঙ্কা দেখিয়ে বেরিয়ে যেতে পারেন। তাঁর সংগে কথা কইবার জন্য সবাই ব্যাকুল, তিনি আমাদের ছবি শেষ করবার জন্য আকুল হবেন কেন? আট বছরের ছেলে থেকে আটাশ বছরের ছেলেদের তিনি মানসী প্রেয়সী। মাসিক পত্রিকায় যত কবিতা সবই ত তাঁকেই উদ্দেশ ক'রে লেখা। যে-সময় ছবি তোলার কথা, তিনি সে সময় কখনও আসবেন না। প্রথম প্রথম অবশ্য আসতেন, তারপরই বেঁকলেন। যাক্, তারপর রং করতে গেলেন দু'ঘণ্টা, রং ক'রে যখন বেরিয়ে এলেন তখন টিফিনের সময় এসে গেছে, বেলা তিনটে আন্দাজ সেটে ঢুকলেন, তিন লাইন নিজের পার্ট বলতে তেত্রিশবার ভুল ক'রে খিঁচোলেন অপরকে। কিছু বলবার জো নেই—বললেই সেখানে কাপড় জামা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গেলেন হয়ত—তাঁকে আবার ধাতে আনতে ছুটবেন ডিরেক্টরবাবু, ঘণ্টা খানেক উনি আর তিনি ঘরে বসে গুজগুজ যে কি করবেন তাঁরাই জানেন।

মেজাজ ঠাণ্ডা হলে পুনরায় দেবীর আবির্ভাব হবে, নচেৎ আপনার মাথায় ডাণ্ডা মেরে বেরিয়ে গেলেন সেদিনকার মত।

অতএব দেবীর পূজোর জন্যে সর্বদা করযোড়ে দাঁড়িয়ে থাক আর বল, দেবী. (মা বলবার উপায় নেই তাহ'লেই বয়েস গেছে বলে ভেঙাচ্চি মনে করবেন, একবার বলে তিনবার কানমলা খেয়েছিলুম) তাই বল, দেবী কৃপা করে উদ্ধার কর, ছবি করতে এসে ঝকমারি করেছি বিবি, এবারটির মত রেহাই দাও। এতে হয়তো তিনি কৃপা করতে পারেন কিন্তু পাঁচ হাজার টাকার কন্‌ট্রাক্ট ইতিমধ্যে বেড়ে তখন পনেরো হাজারে দাঁড়িয়ে গেছে জানবেন। আমাদের ত তাই দাঁড়ালো অন্ততঃ।

তারপর হিরো—সেও আর এক জ্বালা। এঁরও সমভাব—একটা চেয়ার থেকে আর একটা চেয়ারে বসতে তাঁর কুড়ি মিনিট সময় লাগে। তিনি আসবেন দেরী ক'রে যাবেন সর্বাগ্রে এবং যা মেজাজ দেখাবেন তাতে প্রত্যেক সময় প্রযোজকের মাথায় বাজ পড়বে। এর পোষাক পছন্দ হবেনা, জুতো পছন্দ হবে না, চুল পছন্দ হবে না, এমন কি পরে নিজের পার্টও পছন্দ হবে না—প্রেমিকের পার্ট তাঁর, কিন্তু সারা জগতের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে যেন সর্বদা মুখ ভেটকে আছেন। এঁকে স্কন্ধে ক'রে প্রযোজক ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপবেন আর ঢক্‌ঢক্ ক'রে ক্রমাগত জল খেতে খেতে বলবেন, দাদা কেলেংকারি ক'রে ফেলেছি কি করবো—ফের ছবি করতে আসার আগে হারাকিরি ক'রে বসবো সেও ভাল, এবার খেমা ঘেন্না ক'রে পার্টটা ক'রে দাও।

বাপ্‌রে বাপ্‌, পাগল হয়ে উঠলুম ! তারপর এমন ক্যামেরা ম্যান জুটলেন যে, আলো ঠিক করতে করতে দিনের আলো ফুরিয়ে এল, উপরন্তু আর্ধেক সময় ছবি ওঠাতে ভুলে গেলেন বা যে ছবি ওঠালেন তা অদৃশ্য চোখ ছাড়া দেখবার জো রইল না। বললে বলবেন, ফিল্ম খারাপ ছিল। আবার ফিরে ফিরতি তোল !

শব্দ-যন্ত্রীর কথা না বলাই ভাল, চেঁচালে বলবেন সেট্‌ থেকে বেরিয়ে মাঠে যান, আবার আস্তে কথা বললে বলবেন, কাঁটা নড়ছে না, মাঝারি ধরণে বললে বলবেন, লাইফ নেই। শব্দ যে কি ভাবে জব্দ করতে পারে সবাইকে—তা তিনিই দেখালেন। একটি প্রেমের দৃশ্যে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে কথা উঠবে, সে জায়গাটি তিনি এমনভাবে তুললেন, তাতে মনে হল যেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে রেলের ইঞ্জিন হিস্‌ হিস্‌ ক'রে স্টিম্‌ ছাড়ছে, আমি বলতে গেলুম, তাতে তিনি বললেন, মশাই আপনি কি জানেন ? এইটেই লেটেস্ট টেক্‌নিক্‌। মফঃস্বল হাউসগুলোয় দেখবেন কি এফেক্ট দেয় !

এঁরা ছাড়া পরিদর্শক, প্রোডাক্‌শান ম্যানেজার, তাঁর সহকারী ইত্যাদি আরও তিন ডজন লোক রয়েছেন—তাঁরাও আদাজল খেয়ে যতটা পারেন ততটা সুরাহা ক'রে নিচ্ছেন।

ওদিকে পরিচালক মহাশয় তাঁর প্রতিপালকের পালক গজিয়ে দিয়ে একবারে বালকের মত ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদাবার বন্দোবস্ত ক'রে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন—কুথা কন কম,

সিগারেট খান বেশি—ছবির শেষাশেষি একেবারে ভিন্ন লোক তিনি।

করঞ্জাক্ষ বাবু ওদিকে অবিরত চেক্ কেটে চলেছেন কিন্তু ব্যাঙ্কে টাকা কোথায়? বই শেষ হল না—যাঁরা শেষের সময় দেখা দেন, সেই ডিস্ট্রিবিউটররা ছবি দেখে আঁৎকে উঠলেন—বললেন, ও বাবা, এ কী হয়েছে! আমি তবু বললুম, মশাই অনেক ত হয়েছে, আর কি হবে বলুন? নায়িকার পিসিমার মৃত্যু দেখিয়ে করুণ করা হয়েছে, নায়িকাকে সতেরো জনের সংগে প্রেম করানো হয়েছে, তাঁকে গাছের ডালে-আবডালে বসিয়ে গান গাওয়ানো হয়েছে, দু'টো সেমিজ পরবার দৃশ্য দেওয়া হয়েছে, চারবার ব্লাউজ বদল করানো হয়েছে, নায়িকাকে ঘাড়ে নিয়ে নায়ককে দিয়ে খানা ডোবা ডিংগিয়ে ছোটানো হয়েছে, পুকুরপাড়ে গান হয়েছে, ঘরের ভেতরে চাঁদ ওঠানো হয়েছে, হাত ধরাধরি ক'রে ছেলে মেয়েদের হেসে লুটোপুটি খাওয়ানো হয়েছে, দোলনায় দোলান হয়েছে, ছাব্বিশটা দীর্ঘশ্বাস দেওয়া হয়েছে, আর কি হবে বলুন? এর বেশি ত গভর্ণমেন্ট আর কিছু করতে দেবে না, তা হ'লে নয়—

তাঁরা খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, থামুন মশাই, একি ছবি! দূর্ দূর! আমি বললুম, দেখুন সিনেমায় ছবি আর এর চেয়ে কি ভাল হচ্ছে বলুন—একই ত ফর্ম্‌লা!

তাঁরা দন্ত কড়্মড়্ ক'রে বলে গেলেন, আপনার মাথা!

দেখে আসুন, হনুমানের আলুরদম ভক্ষণ, একুশ সপ্তাহ চলেছে। তার ক্যাবারের নাচ, তার গান, তার বিলিতি সেটিং, তার ট্রিক্ সিন্ দেখলে ক্ষেপে যাবেন। এক হনুমানকে নিয়েই তেত্রিশখানা ছবি বাজার মাৎ ক'রে দিলে অপরে, আর আপনারা এখানে বসে বসে ন্যাজ নাড়ছেন।

তাঁরা রেগে চলে গেলেন! তখন ভাবলুম, সত্যিই এদেশে আমাদের দর্শকদের কাছে ল্যাজ বাদ দিলে চলে না. অধিকাংশই তাতে অস্বোয়াস্তি বোধ করে। কিন্তু উপায় ছিল না আর কিছু করবার।

টাকার অভাবে ছবি বন্ধ রইলো, পরিচালক পালালো, প্রযোজকও হাওয়া। আমি পড়লুম ফাঁপরে। শেষে মশাই, এক গুড়ের কারবারিকে ধরে কোনক্রমে মাথা খাটিয়ে ছবি ফিনিস্ করেছি। তবু ছবি বাজারে বার করতে পারা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে একুশজন হাইকোর্টে ইন্‌জাংশানের জন্যে দরখাস্ত করেছেন। যদি পাওনাদারদের সামনে কোনদিন এটি মুক্তি পায়, তাহলে দয়া ক'রে ছেলেপুলেদের না নিয়ে একদিন কর্তা-গিন্নি জোড়ে দেখে আসবেন. বোধ হয় খারাপ লাগবে না। প্রাণ আনচান্ ক'রে ওঠার সম্ভাবনাই সমধিক!

শোকসভা

কলকাতা শহরের হুজুক, বাজী, সার্বজনীন পূজো আর অ্যাম্‌প্লিফায়ারের ঠেলায় প্রায় পাগল হব হব অবস্থায় হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে নিজের দেশে অর্থাৎ ভজগোবিন্দপুরে দৌড় মেরেছিলুম, ভেবেছিলুম যাক, পল্লীগ্রামে গিয়ে এক মশার আওয়াজ আর গভীর রাতে শেয়ালের ডাক ছাড়া আর কিছু কানে আসবে না, প্রাণে একটু পুলক জাগবে, মাথাটা ঠাণ্ডা হবে। কিন্তু ও হরি, দেখলুম শহরের যা কিছু উৎপাত সবগুলি এমেচারি ঢংয়ে সেখানেও ঢুকেছে। নিশ্চিন্দি হওয়ার ব্যাপারটা আমার বরাতে বিধাতা কোথাও লিখে রাখেন নি, বেশ বোঝা গেল।

পাড়ার কে এক গাঙ্গুলী মশাই, গভীর রাত্রে তাড়ি খেয়ে নিজের বাড়ির ছাদ থেকে আলটপ্‌কা পড়ে গিয়ে মারা গেছেন, তাঁর জন্যে সমব্যথীরা ও মরমীয়ারা এক বিরাট শোকসভার আয়োজন করেছেন—পাড়ায় হৈ হৈ পড়ে গেছে। যিনি সভাপতি তিনি বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ শোনার পর ভবিষ্যতে আর ও জিনিস এক বিন্দু পান করবো না বলে বর্তমান কালটাকে তাড়াতাড়ি মুছে ফেলতে সপ্ত সিন্ধু মন্থন ক'রে যেরূপ গণ্ডুষ ভরে পীযূষ পান করেছেন, শোনা গেল তাতে

আর তাঁর হুঁস নেই। তিনি আসতে পারবেন না বলে এক বাণী পাঠিয়েছেন, অতএব আমাকে নিয়ে পাড়ার লোক টানাটানি শুরু করলেন। সকলের নাকি সমবেত ইচ্ছা—আমি সভাপতি হই।

আমি করযোড়ে উদ্যোক্তাদের কাছে নিবেদন করলুম, রক্ষে করুন মশাই, এ বাজারে সংসারের একপতিত্ব করতেই হাঁপিয়ে উঠেছি, এখন গোটা একটা সভার পতিত্ব করা আমার পক্ষে অসম্ভব—ও আমি পারবো না, অব্যেস নেই, মারা পড়বো!

তা কে শোনে সে সব কথা। পুরোনো খবরের কাগজের ওপর কলমের উল্টো পিঠ দিয়ে ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া ক'রে কালিতে নাম লিখে সারা গাঁয়ের চারধারে—মায় স্টেশনে পর্যন্ত নোটিশ টাঙিয়ে দিয়ে এল।

বিরাট ব্যাপার! অভূতপূর্ব কাণ্ড! অদ্য বৈকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় মনসাতলার হাটে পল্লীর সর্বজনপ্রিয় স্বর্গীয়

কালাচাঁদ গাঙ্গুলীর শোকসভা। দলে দলে যোগদান করুন। অমুক সভাপতিত্ব করিবেন, অমুক প্রধান অতিথি হইবেন, অমুক উদ্বোধন করিবেন, তমুক পরিচালনা করিবেন ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসা করলুম, ভাই, কতক্ষণ আমায় আটকে রাখবে? বললে, ঘণ্টা তিন চার!

আমি ত হাঁ! শোকসভা ঘণ্টা তিন চার ধরে চলবে, বল কি? গাঙ্গুলী মশায়ের বাড়ির লোকও বোধহয় এতক্ষণ ধরে শোক করেনি।

তারা বললে, বাড়ির লোকের চেয়ে দেশের লোকের দরদ ত বেশীই হয়ে থাকে—ও আপনি কিছু ভাববেন না। ওর সঙ্গে একটু ভ্যারাইটি করার চেষ্টা হচ্ছে কিনা—কলকাতায় লোক বেরিয়ে গেছে।

কি যে মাথা মুণ্ডু আরও সব বললে বুঝলুম না। বিকেলে নিয়ে যাবার কথা, বেলা দুটোয় দলবল এসে আমায় নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে দিলে, পাছে আমি পালাই। তখন কোথায় লোকজন আর কোথায় কি! আমি সভা বসার আগে ভ্যাবা গঙ্গারামের মত হা পিত্যেস ক'রে বসে। শুনলুম লোক ডাকতে গেছে। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে একেবারে নাকি লোক গিজগিজ করবে। নোটিশ পড়ে গেছে—দেখুন না।

কিসের নোটিশ? কেউ কিছু জবাব দিলে না। যাক, লোক না এলেই বাঁচি, তাড়াতাড়ি সভা ভেঙে পালানো যাবে,

কিন্তু শোকসভা যে কি বস্তু সে ত পূর্বে জানা ছিল না—এবার জানলুম।

মশাই, আশ্চর্য! বেলা ৪টের পর থেকে দেখি দলে দলে লোক আসতে শুরু করলে। শোকসভায় এত লোক, ব্যাপার কি? আমাদের ওদিকে ত লোক ভাড়া ক'রে আনতে হয়। আমাদের পাড়ার চাটুজ্যে মশাই মারা যেতে একবার সভা করেছিলুম, তাতে মনে করুন দু'শো মুটে ডেকে ঘণ্টায় দু' আনা ক'রে ভাড়া দিয়ে বসিয়ে রাখতে হয়েছিল, কিন্তু এখানে আকস্মিক এত লোক শোক করতে আসছে দেখে ত আমি অবাক! ভাবলুম হয় এরা সব কটা ভণ্ড, নয় স্বর্গীয় গাঙ্গুলী মশায়ের সমধর্মী। কিন্তু তাও ত নয়—মেয়েরাও আসে যে।

পরে সভা বসতে বুঝলুম জনাধিক্যের কারণটা কি! প্রথমেই বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত—দশ মিনিট সবাই দাঁড়িয়ে। পৃথিবীর কোথাও জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে ঠায় এতক্ষণ লোকের ভোগান্তি বাড়ানো হয় বলে ত শুনিও নি। যাক, পা ধরে এলেও বসবার ত জো নেই। সেটা শেষ হল।

তারপর সভাপতি বরণ। একটি তোৎলা ভদ্রলোক আমার নাম প্রস্তাব করতে উঠলেন। আমার নাম, পদবী সমস্ত ঘুলিয়ে ফেলে তিনি এমন কাণ্ড ক'রে বসলেন যে লোকে হো হো ক'রে হেসে অস্থির, শেষে আবার সংশোধন করতে গিয়ে আরও কেলেঙ্কারী ক'রে বসলেন—একটা

কথাও উচ্চারণ করতে পারেন না, শেষে আমি ক্ষেপে উঠে নিজের নাম ধাম বলে সটান চেয়ারে বসে পড়লুম।

যে ভদ্রলোক তাঁকে সমর্থন করতে যাচ্ছিলেন তিনি মুখটি হাঁ করতে দর্শকরাই বলে উঠলো, থাক হয়েছে। ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে পালাবার পথ পেলেন না। প্রধান অতিথিকে অতঃপর আমি নিজে হাত ধরে টেনে তাঁর নামটা জিজ্ঞেস ক'রে, নিজেই প্রস্তাব সমর্থন ইত্যাদি যাবতীয় কার্য সম্পন্ন ক'রে পাশে বসিয়ে দিলুম।

এরপর মাল্যদান। একটি খুকীকে কোথা থেকে নড়া ধরে শূন্যে তুলে তার মারফৎ আমার গলায় একটি তারের মালা ঝুলিয়ে দেওয়া হতেই আমি উঃ ক'রে উঠলুম। কারণ ফুলের চেয়ে তারের খোঁচা বেশী অনুভূত হ'ল! খুকীটি ইতিমধ্যে ভড়কে গিয়ে আর প্রধান অতিথির গলায় মালা দিতে বোধহয় ভরসা পেলে না। তিনি হাঁড়িকাঠে মাথা গলানোর ভঙ্গীতে ঘাড়টা এগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু

গলায় আর মালা ঝোলে না—শেষে তাড়াতাড়ি আর

একজন তার হাতটা হেঁচকে গলার দিকে এগিয়ে দিতেই সে মালাটা উল্টো পরিয়ে দিয়ে দুড়দুড় ক'রে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। লোকের তাতে কী হাসি আর হাততালি! বুঝলুম শোক একেবারে গোড়াতেই কুলপী বরফের মত জমে গেল।

যাক, প্রচলিত পর্ব শেষ হতেই আরম্ভ হল, ভ্যারাইটি। তখন বুঝলুম এত লোক আসার কারণ কলকাতার গাড়ী থেকে আর্টিস্টরা নামতেই দাবানলের মত ব্যাপারটা গাঁয়ে ছড়িয়ে গেছে, তাই অত ভীড়। কিন্তু শোক সভাটা শেষ ক'রে সেগুলো আরম্ভ করলে ভাল হয় বলে প্রস্তাব করতে যাচ্ছি, কিন্তু তার আগেই খেল শুরু হয়ে গেল। পরিচালক ঘোষণা ক'রে দিলেন, কলকাতা ক্যানেস্তারা ফিল্ হারমোনিক্ অর্কেস্ট্রার ঐক্যতান। শুরু হল—বাজনা। ঐক্যতান ঘোষিত হলেও যন্ত্রগুলির এরূপ বিদকুটে অনৈক্য জীবনে দেখিনি। অর্থাৎ যে কটা যন্তর বাজছে, তাদের প্রত্যেকটা চোখ বুজে শুনলেও নিজের নিজের স্বতন্ত্র সত্তা বেশ ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়। তিনটে বেহালা তিনদিকে, হারমোনিয়াম উল্টোদিকে আর অন্যগুলি দিকে দিকে ছুটছে। দশ মিনিট গর্ভযন্ত্রণা দিয়ে ঐক্যতান থামলেন।

তারপর ছিঁচকেমণি পালিতের আধুনিক গান—প্রিয় আসিবে বলিয়া সারাদিনরাত বাঁশবনে বসে আছি, আর কত খাব মশার কামড়, কত বা তাড়াবো মাছি। ইনিও দশ

মিনিট ধরে ফোঁপালেন। ভাবলুম, যাক, এতেই বোধহয় লোক দমেছে, কিন্তু ঠিক উল্টো—আর একখানা. আর একখানা, ক'রে দুর্দম চীৎকার। কড়া চাপানোই ছিল, তিনিও আর একখানা ছাড়লেন।

তাঁর গানের পরই কুমারী দীর্ঘাঙ্গী চট্টোপাধ্যায়ের আবাহন নৃত্য। একে সরু লিকলিকে হাত পা, তার ওপর মনে করুন, আবার কাগজের ঠুঙি পরে লম্বা লম্বা নোক তৈরী হয়েছে, শরীর একেবারে আনচান ক'রে উঠলো। তাঁর আবাহন নৃত্য দেখে মনে হল, স্বর্গীয় গাঙ্গুলী মশাই নিশ্চয় স্বর্গ থেকে তর্‌তর্‌ ক'রে নেমে এসেছেন এবং সম্ভবতঃ খুব শিগ্‌গিরই বল্‌ডান্সের পার্টনার ক'রে বেচারীকে নিয়ে যাবেন। ওঃ, অসহ্য!

দশ মিনিট গেল দীর্ঘাঙ্গীর, তারপর নানারকম বিতিকিচ্ছিরি অঙ্গভঙ্গী ক'রে নোন্তামুকুজ্যে কমিক দেখালেন। সেও একবারে শেষ হল না—আবার আবার ক'রে চারবার। ভাবলুম এরা এই রকম করেই রাত কাবার করবে বোধ হয়, আমি পালাই, কিন্তু উঠতে দিলে ত! ঘোষণা চলেইছে—এইবার শুনুন ফোঁপরা দত্তের ফিল্ম সঙ্গীত, গোঁত্তা মিত্তিরের কাওয়ালি গান, ফোকলা ভট্‌চায্যির রবীন্দ্র সঙ্গীত, চাকলা দেবীর কেত্তন ইত্যাদি।

আমি একে ডায়েবিটিস রুগী, দু' ঘণ্টার মধ্যে বার তিনেক চক্ষু লজ্জার মাথা খেয়ে বাইরে গেছি, কিন্তু আর কতবার

যাব, লোকে ভাববে কি, বলে বসে রইলুম। ওদিকে পেট টন্‌টন্‌ ক'রে শরীর কেমন কেমন করতে লাগলো। সভাপতি হওয়ার এত জ্বালা আগে টের পেলে কোন্‌ ইয়ে এ কার্য করতে আসতো! শেষে উদ্যোক্তাদের ডেকে বললুম, ভাই, গাঙ্গুলী মশায়ের শোকসভায় তোমরা এ কি কচ্ছ?

সেক্রেটারী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, তা না হলে যে লোক আসে না স্যর, এটা বোঝেন না?

আমি বিনীতভাবে বললুম, তা বুঝিছি ভাই, তা এর ফাঁকে ফাঁকে বক্তৃতাগুলো ঢুকিয়ে দাও না কেন?

তাতেই তারা রাজী হয়ে গেল—প্রধান অতিথি এসেছেন কলকাতা থেকে, তাঁকেই আগে ওঠানো হল। তিনি উঠেই স-চীৎকারে সুর ক'রে টেনে টেনে বক্তৃতা শুরু করলেন—

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত মহিলা ও ভদ্রলোকবৃন্দ, আজ এই শোকসভায় প্রধান অতিথিরূপে আপনারা আমায় বরণ করলেন যে কেন, তা জানি না, কারণ আমার মত অযোগ্য অক্ষম ও অবিজ্ঞ ব্যক্তি এ সম্মান পাবার পক্ষে অনুপযুক্ত আমি জানি। (চড় চড় ক'রে তাতেই হাততালি পড়ে গেল, আমিও শ্রোতাদের বিদ্যেবুদ্ধির দৌড় এতেই খানিকটা বুঝলুম, কিন্তু অতিথি মহাশয় তাতে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন)। আজ স্বর্গীয় হারাধন গাঙ্গুলী মহাশয়ের শোকসভায় এসে (ঠিক এই সময় একজন দর্শক

পেছন থেকে নামটা শুধরে দিতে চীৎকার ক'রে উঠলো, হারাধন নয় কালাচাঁদ। তিনি তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলে উঠলেন) আজ্ঞে হ্যাঁ, কালাচাঁদ গাঙ্গুলী মশায়ের সভায় এসে যে কি বলবো, কিছু ভেবে পাচ্ছি না—কারণ আমি তাঁর সম্বন্ধে কিস্‌সু জানি না। (এই সময়ে অস্ফুট স্বরে কে একজন রসিক দর্শক বলে উঠলো, মরেছে। বে-জায়গায় এ রকম একটা মন্তব্য শুনে দু' চারজন কু'ক কু'ক ক'রে হেসে ফেললে। বলা বাহুল্য বক্তার কানে সবই পৌছতে তিনি ক্ষেপে উঠে হঠাৎ গলার স্বরটা আরও চড়িয়ে বলে উঠলেন) না জানলেও এটুকু আমি জানি, একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন কালাচাঁদবাবু। তা না হলে তাঁর শোকসভায় এত লোক শ্রাদ্ধ করতে ছুটে আসবে কেন? এত লোক আনন্দ করতে আসবে কেন? বাঙালীর মনে যত দুঃখুই থাক, তার আনন্দটুকু এখনও যায়নি বলেই সে আজও বেঁচে আছে। আজ আনন্দ কর ভাই, আনন্দ কর। গাঙ্গুলী মশাই উচ্চমার্গের লোক ছিলেন, তাই উচ্চস্থান থেকে ভাবাবেগে লাফিয়ে পড়ে তিনি ঊর্ধ্বগতি পেয়ে গেছেন। এমন ক'জন পায়? এত সাহস আছে ক'জনের? তাঁর সাহসিকতা অদ্ভুত, তিনি ভেতো বাঙালীর আদর্শ স্বরূপ। আমরা একটা খানা ডোবা পেরুতে কাৎ হয়ে পড়ি, তিনি ছাদ থেকে পড়েন, এর তুলনা নেই। আমাদেরও প্রত্যেককে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে, তবে মুক্তি পাব, তবে জাতি জাগবে, তিনি বিংশ শতাব্দীর শেষ শহীদ—তাঁকে যেন আমরা

না ভুলি (যেই শহীদ বলা আর হাততালির ধুম কী। কত-গুলো ছোকরা আবার এর ওপর পাঁচটা আঙুল মুখে পুরে সিটি দিতে শুরু করলে, অতিথি ভারী খুশী। তিনি আরও উৎসাহ সহকারে শুরু করলেন) কিন্তু ভাই সব, এই সদানন্দ পুরুষের শোকসভায় এসে আজ যে আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন আপনারা করেছেন তার তুলনা নেই। আজ ত কাঁদবার দিন নয়, আজ তাই কাঁদবো না—চুপি চুপি অন্যদিন কাঁদবো, আজ হাসবো সকলে—প্রাণভরে হাসবো, আপনারাও হাসুন। (সকলের হো হো ক'রে হাসি, আর করতালি ধ্বনি আর সিটি, সমানে এক মিনিট ধরে চললো। ভাবলুম এই জমার মুখে তিনি বোধ হয় আসন গ্রহণ করবেন, কিন্তু উল্টো হল! তিনি ফের শুরু করলেন।) আর এক মিনিট আমি আপনাদের নেব, একটা কথা শুধু বলবো, বলে অনর্গল আজে বাজে বকে যেতে লাগলেন! ভদ্রলোক যেটুকু জমিয়ে এনে-ছিলেন তা আরও চল্লিশ মিনিট পেরুতে গলতে শুরু করলো। লোকে প্রথমে হাই তুলতে লাগলো, পরস্পরের সুখ দুঃখের কথা শুরু করে দিলে, তারপর মাটিতে পা ঘসতে লাগলো, তারপর অবিরত হাততালি দিতে লাগলো, তাতেও তাঁর চৈতন্য হল না। অবশেষে পেছন থেকে আমি তাঁর পাঞ্জাবীর দুটো খুঁটো ধরে টেনে চেয়ারে বসিয়ে দিলুম।

ঘোষণা করে দিলুম। আমার যা বলবার ছিল তা পূর্ববর্তী বক্তা সবই বলে ফেলেছেন, আর যা বাকী আছে,

সেইটুকু বলে দিয়ে যাই। আজকের সভার বক্তৃতার পালা এইখানেই শেষ। কমিক আইটেম সবই তো হয়ে গেল, আপনারা এইবার পুরো দমে নৃত্যগীত উপভোগ করুন, আমার ট্রেণের সময় হল, আমি বিদায় নিচ্ছি। এখন দ্বৈতনাচ হবে। নাববেন—ল্যাক্‌প্যাক্‌ তালুকদার ও ধুমসোমনি হালদার! নমস্কার!

বাড়িয়ে বলা

সত্যি কথা ত ইদানিং লোকে বলতে ভুলে গেছে—তার ওপর একটা কিছু হুজুগ পেলে রক্ষে আছে? একেবারে ভোল পাল্টে ছেড়ে দেবে! একে ত শতকরা পঁচাশি জন মিথ্যেবাদী, উপরন্তু বাকী দশ পনেরো জন পুরো মিথ্যুক না হলেও রং ফলিয়ে এমন সব কথা বলবে যে, খাঁটি কথাটা যে কি তা খুঁজে বার করতে মাথার চাঁদি ফেটে ঘিলু বেরিয়ে পড়বে। পৃথিবীতে কারু কথাটা যে বিশ্বাস করবো তা আজও বুঝতে পারলুম না।

যুদ্ধুর শুরু থেকে মিথ্যের চাষ শুরু হয়েছে, তারপর স্বাধীনতা পাওয়ার সময় এক প্রস্থ গেছে, এখন ইলেকশনে দিব্যি চলছে—পরেও যে সিনেমার ছবির মত কত সপ্তাহ চলবে তা বলতে পারি না। যা-যুগ পড়েছে তাতে দেখছি মিথ্যেই সবচেয়ে হিট্ করে বেশি, আর আসল সত্যি গুঁতোর চোটে চিট্ হয়ে যায়।

দেশে কোন হুজুগ বা মোচ্ছব এলে আমি খবরের কাগজ পড়ি না, মাথা ঘুলিয়ে যায়। মিটিংয়ে যাই না, কারণ এত ভাল ভাল লোক বক্তৃতা করে যা শুনলে মনে হয় যে, এঁদের মত সব লোক থাকতে পোড়া দেশে এত দুঃখু কেন? তারপর

বাড়ি গিয়ে যখন হাঁড়ির অবস্থা দেখি তখনই মনে হয়, দূর তোর নিকুচি করেছে, সবাই যে-যার তালে আছে, সত্যি কথা বলছে না। অবশ্য বললে তাকে আর চলা-ফেরা ক'রে ঘুরে বেড়াতে হত না, পাঁচজনে মেরে শুইয়ে দিত, সেটা ঠিক। এদেশে সত্যি কথা বলাটা ক্রমশঃ অনিয়মে দাঁড়াচ্ছে বেশ বুঝতে পাচ্ছি।

তা ছাড়া এই বকস্বেয়ে দেশে মানুষ সত্যি কথা বলতে গিয়ে এত খাদ মেশাবে, যে সেটা মুখ ফেরতা হতে হতে দাঁড়াবে উল্টো। এরা তিলকে তাল করবে, আর তালকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমন দাঁড় করাবে যে, সামাল্ সামাল্ ক'রে ডাক ছেড়ে কাঁদতে হবে। তা যদি না হত তাহ'লে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গাও হত না। রং চং ক'রে বাড়িয়ে বলে আমরা স ম য় সময় যে-রস সৃষ্টি করি তা ক্রমশঃ সবাইকে অবশ ক'রে ফেলে। এটা আমাদের স্বভাব—তা না হলে নাটক জমে না এদেশে। এ ক থা বলছি কেন তা দু' একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝতে পারবেন।

মশাই কিছুদিন আগে বাড়ি থেকেই হ'ক কিম্বা ট্রাম থেকেই হ'ক আমার একটি ছাতা খোওয়া গিয়েছিল, বাড়িতে সে কথাটা বলেওছিলুম! গিন্নী তাই শুনে ছাদে গিয়ে বিকেলবেলা পাশের বাড়ির এক বান্ধবীকে সেই কথাগুলিকে বেশ ইনিয়ে বিনিয়ে বল্লেন, আর ভাই, চোরের কথা বোলো না—আজকাল কি উপদ্রবই না হচ্ছে, উনি আপিস থেকে ফিরছেন, ফস্ ক'রে একজন ওঁর হাত থেকে ছাতাটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল।

গিন্নীর বান্ধবী, মুকুজ্যে গিন্নী গালে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, ও মাগো বল কি! যাক্‌গে ভাই ছাতার ওপর দিয়ে গেছে-তাই রক্ষে, যদি নেবার সময় আবার মাথাটা ফাটিয়ে দিয়ে যেত, তাহ'লে কি সর্বনাশ হত বল ত? আমার কর্তারও চির-কাল ঐ ছাতা নিয়ে বেরোনো বদ্ স্বভাব। এবার সেটাকে লুকিয়ে রেখে দেব। দিনকাল যা পড়েছে শেষে কি একটা তুচ্ছ জিনিসের জন্যে প্রাণ যাবে।

রাত্রে মুকুজ্যে গিন্নীর মারফৎ মুকুজ্যেমশাই শুনলেন যে, চোরে রাস্তায় আমার মাথায় এক ঘা ছাতার বাড়ি মেরে চলে গেছে।

মুকুজ্যেমশাই আপিসে গিয়ে বলে উঠলেন, দিনকাল যে কি খারাপ পড়লো তা আর বলা যায় না। আমার এক প্রতিবেশী আপিস থেকে কাল ফিরছিলেন, তাকে বেচারারা সামান্য একটা জিনিসের জন্যে বেধড়ক্ মেরে রাস্তায় অজ্ঞান ক'রে ফেলে রেখে যায়—এখন সে বিছানায় শুয়ে বার্লি খাচ্ছে।

রায়মশাই সেটা শুনে আবার আর এক ডিপার্টমেণ্টে খবর দিয়ে এলেন যে, মুকুজ্যের পাড়ার অমুক লোককে একদল ডাকাত রাস্তায় অজ্ঞান ক'রে ফেলে রেখে যথাসর্বস্ব কেড়েকুড়ে নিয়ে চলে গেছে। মায় কাপড় জামা পর্যন্ত নিয়ে শুধু একটি নেংটি পরিয়ে তাকে ফুটপাতে উবুড় ক'রে রেখে গিয়েছিল, রাস্তার লোক পরে হাসপাতালে দিয়ে আসে তাই রক্ষে। একেবারে অরাজক উপস্থিত।

এর বন্ধুবান্ধবরা আবার রং ফলিয়ে অন্যান্য জায়গায় ঘটনাটির বিবরণ দিলেন। মানে, আমার অবস্থা তখন লোকের মুখে মুখে। গোলকধাঁধার ঘুঁটির মতন তাঁদের মর্জিমাফিক্ একবার চিৎ একবার উপুড় হতে হতে অকুস্থলের দিকে এগোচ্ছে আর ছটকে বেরিয়ে আসছে এই আর কি। এর পরে আবার নরকে পতনও আছে। অনেকে আবার অনুমান করতে লাগলেন যে, খামকা আমাকে মারার কারণটা কি! কেউ বললেন, নিশ্চয় মাইনে আনছিল, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা মাথা নেড়ে বলে উঠলেন, উঁহু! মাইনে আনলে শুধু পকেট কাটতো, টাকাকড়ি ছাড়াও নিশ্চয় এর মধ্যে আরও গোপন ব্যাপার আছে—সম্ভবতঃ প্রেমঘটিত!

ব্যস্! মোড় ফিরলো। সেই উঁহু ক্রমশঃ হু হু ক'রে বাড়তে বাড়তে গিন্নীর কানে পৌঁছল। তিনি আর আমাকে উঁহু করবার অবকাশ না দিয়ে একেবারে কুহু কুহু ডাকিয়ে ছাড়লেন। একমাস তাঁর ঝাঁজে মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা যাবার

অবস্থা ঘটতো। বুঝুন, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

মানুষ কানে দেখে এবং সেই কানে জলের মত সব ঢেকে এবং সেটি যখন পেকে বেরিয়ে আসে, তখন তার রূপ দেখে মুখ ঢেকে পালাবার পথ থাকে না। এ যে কী মানুষের স্বভাব বুঝি না।

এই বাড়িয়ে বলা নিয়ে একসময় কত যাচ্ছেতাই কাণ্ড ঘটে গেছে। শুনলে তাজ্জব বনে যেতে হয়। সে সময় ছেলে-ধরার খুব হুজুগ। একদিন বাড়িতে গিয়ে শুনি যে, কে খবর দিয়ে গেছে যে, কেঁদোটাকে কারা নাকি বায়োস্কোপ থেকে ধরে নিয়ে গেছে। আর যায় কোথা! ভুঁটে, ধুমসো, ন্যাংচা একেবারে কলকাতা শহর তোলপাড় ক'রে এল—এ নিশ্চয় ছেলেধরার কাজ!

আমি যত বলি, ধুমসোকে ছেলেধরায় ধরবে? পঁচিশ বছরের বুড়ো দামড়া ক্রেনে ক'রে ওকে লরিতে তুলতে হয় ও ধরা পড়বে ছেলেধরার ঝুলিতে? কোথায় আড্ডা মারতে গেছে-দেখ—তা সে কথা শুনতে ওদের বয়ে গেল। বাবুরা হৈ হৈ করতে করতে রাস্তায় গোটা ছয়েক ঘটনা ঘটিয়ে যখন বাড়ি ফিরে এলেন তখন দেখেন ধুমসো কাৎ হয়ে বৈঠখানায় গড়াচ্ছে।

এই ত ব্যাপার! কত বলবো? একটি ভদ্রলোক নিজের ছেলেকে কাঁধে নিয়ে ছোটমেয়েকে হাত ধরে, দুর্ভাগ্যর বিষয়,

সুজি কিনতে বেরিয়েছিলেন হঠাৎ—'এই ছেলেধরা' রব্ উঠলো। অমনি দমাদ্দম মার, ছেলেমেয়ে ভুঁয়ে গড়াগড়ি। রাস্তার লোকে বাজারের থলি ফেলে গলি থেকে বেরিয়ে এসে মারতে শুরু করলে। সে ভদ্রলোক যত বলে, আমি এদের বাবা, লোকে তত তাঁর মুখে থাবা দিয়ে চুপ করিয়ে ঠেঙায়। ভদ্রলোক হাবা হয়ে গেলেন ব্যাপার দেখে, শেষে পুলিশ এসে বাঁচায়—পরে স্ত্রীর সেবা খেয়ে দু'হপ্তা পরে চাঙ্গা হন।

এই যে বললুম যদি একটা আধটা সত্যি ঘটনা কোথাও ঘটে সেটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এরা দেশ কাঁপিয়ে ছাড়বে। এই সময়েরই ব্যাপার। আমাদের ঠিকে ঝি ত্রিখণ্ডী বস্তা ভরে খালধারে তিনটি বিল্লী পার করতে গিয়েছিল, তারা ম্যাও ম্যাও করতেই আর যায় কোথা! তাকে ছেলেরা চাঁটি মারতে মারতে আর চলো চলো দিল্লী চলো বলতে বলতে ঝুঁটি ধরে থানায় নিয়ে এল। শেষে ঝুলি খুলতেই বেরালগুলো ছুটে ফের বাড়ি ফিরে আসে তবে বাঁচোয়া।

অত কথা কি, ঐ সময় বুঝে বুঝে আমাদের পাড়ার ঝিঙে দত্ত নিজের গুটি পাঁচেক নেণ্ডিগেণ্ডিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় বেরিয়েছিলেন—খিদিরপুরের কাছে একেবারে ধোবি ধোলাই খেয়ে পরে মাথা সেলাই করে ছ'মাস বাড়িতে বসে থাকতে হল।

আমি ত ভয়ে সে সময় নিজের বাড়ির ছেলেপুলেদের

ত্রিসীমানার কাছে ঘেঁসতে দিতুম না। রাস্তায় দূর থেকে দেখলেই গলির মধ্যেই ঢুকে পড়তুম। কারণ, সর্বদা ভয়—কোন্ সময়. বাবা নেবুঞ্চুস কিনে দাও বলে নেত্য করতে করতে কে গা ঘেঁসে দাঁড়াক, তারপর তাই দেখে বে-পাড়ার ন্যাংচা, ধুমসো, কেঁদোর দল আমায় নেবুঞ্চুসের বদলে মাসখানেক মাগুর মাছের জুস খাওয়াবার ব্যবস্থা করুক, এই আর কি! রামঃ—শর্মা ওদিকে নেই।

হুজুগ দেখে দেখে মানুষের সত্যি কথাকেও আজকাল গল্প কথা বলে আমার মনে হয়! গত দাঙ্গার সময় এই রকম কথা শুনেছি, ছেলেধরার হুজুগের সময় ঐ, ঝিন্‌ঝিনিয়া রোগের প্রাদুর্ভাবেও ঠিক একই রকম। কোথাও কিছু নেই রাস্তায় খামকা একটা লোককে চেপে ধরে বসিয়ে হুড়্ হুড়্ ক'রে মাথায় জল ঢালতে লাগলো। তারপর নেপাল বাবা এলেন। উড়িষ্যায় বসে তিনি যা খেল দেখালেন তাও অভিনব। তাঁর নাম শুনেই কত লোকের ব্যায়রাম সেরে যেতে লাগলো। পরে এল পাকিস্থান লড়াই করতে আসছে—রাণাঘাটে এসে কেল্লা তৈরী ক'রে ফেলেছে, এ সব নাকি লোকে দলে দলে দেখে এল। এখন বাকী ছিল ইলেক্‌শন, তাই চতুর্দিকে লক্ষ দলের স্তোতগান শুরু হয়েছে। ভোটের দিন যেটুকু প্রাণ আমাদের এখনও ধুক্‌পুক্ করছে তা বোধহয় স্রেফ্ হেঁচকা হেঁচকিতেই বেরিয়ে যাবে।

দেশের সেবা করবার জন্যে লোকেরও অভাব নেই, তাঁদের

সম্বন্ধে বানিয়ে বানিয়ে বলিয়ে কইয়ে লোকেরও খামতি নেই, তাই সবার বিবরণ শুনে কে যে আমার সত্যি আপন জন তাই ভাবতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছি।

ইলেক্‌শান

আমার ন'কাকার মেজছেলে গবাক্ষ, জীবনে মশাই কোনদিন রাজনীতি করে নি, বড়বাজারে একটা ছুঁচের কারবার আছে, তাতে দু' পয়সা করেও ছিল, কিন্তু স্বাধীন ভারতে ইলেক্‌শানে নেমে যা খোয়ার হল তা আর কহতব্য নয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নাম প্রত্যাহার করতে হল, তাও আমার পরামর্শে, না হলে জন্মের মত আহার নিদ্রা ঘুচে যেত, ইতিমধ্যেই অনিদ্রা রোগ দাঁড়িয়ে গেছে।

কি এদের বলবো বলুন। ঠিক গুণে একুশ'শোবার আমি তাকে বারণ করেছিলুম যে, দেখ্‌ এসব নির্বাচনের ব্যাপারে মাথা গলাস্‌ নি, এ ছুঁচের কারবার নয়, ছুঁচোবাজীর ব্যাপার, ও-তে থাকিস নি, তার চেয়ে এই শীতে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে চতুর্দিকের ব্যাপার স্যাপার দেখ্‌, আর সকার বকার শুনে যা, আরাম পাবি, কিন্তু সেসব কথা তিনি কানে তুললেন না, তাঁকে নাকি দু'শোটা ক্লাব আশ্বাস দিয়েছে যে, ভাল চাঁদা দিলেই তারা লোককে হাত পা বাঁধা অবস্থায় নির্বাচন কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে এবং তাঁরা ওকে ভোট না দিয়ে কোথাও যেতে পারবে না। গাধাটা সেই কথায় বিশ্বাস ক'রে কোনমতে দাঁড়িয়ে গেল, তার ফলে হাজার পাঁচ সাত শুধু সিঙ্গাড়া আর চা

খাওয়াতেই গলে গেছে, শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলে আরও তিরিশ চল্লিশ হাজার যেত—সুনিশ্চিত।

ছিঃ ছিঃ! এ কি বৃটিশ আমল যে শুধু ইংরেজ মার, বললেই নির্বাচনে জয় সুনিশ্চিত, এ একেবারে খাঁটি স্বদেশী নির্বাচন। তুমি যতই বাচনভঙ্গী প্রকাশ কর, তোমার মাসতুতো ভাইয়েরা তুকি নাচন দেখিয়ে ছাড়াবে। ক'দিনেই যা হল না—তাই যথেষ্ট!

প্রথমে ত কোন পার্টিতে তোকে নিলে না—দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী, হুম্‌দাম্‌পন্থী, প্রত্যেকে যা টাকা চাইলে তা দেবার ক্ষমতা হল না বাবু, ভাবলেন বিশ তিরিশ হাজার ওদের খামকা দিই কেন, নিজেই খরচ করবো—তারপর আর কুল পান না। বাবুর কর্মীর মধ্যে নিজেদের দোকানের ক'জন কর্মচারী, আমার বাড়ির ভুঁটে, ধুম্‌সো, নেংচা, কেঁদো আর তাদের রকের বন্ধু ঘড়াঞ্চে, তড়্‌বড়ে, বব্বুলে, খড়কে, আর পাক্‌ তেড়ে এই ত। তাও কেউ নির্ভরযোগ্য নয়।

আমি নিজের চোখে দেখলুম ঘড়াঞ্চেটা সকাল বেলায় হাজরা পার্কে এক পার্টির জন্যে চীৎকার করছে, বিকেলে বরানগরে ঠিক বিপরীত এক দলের সমর্থনে বক্তিমে সুরু করেছে, সন্ধ্যে বেলায় বেলেঘাটায় 'লে-লে-লে' পার্টির সর্দারী ক'রে বেড়াচ্ছে, রাত বারটার সময় গবার কাছে তাঁর আসবার সময় হল। তাও হ'ত না, কিছু টাকার প্রয়োজন ছিল। আমি গবাক্ষকে সর্বপ্রথম তাই বললুম 'লে-লে' বেটার সর্দারকে

আগে হাটাও, কিন্তু তখন তাড়িয়েই বা নেয় কাদের? অপর যারা তারা আবার শুধু 'লে-লে যা পারিস্ লে' নয় একেবারে 'সর্বস্ব লিয়ে লে'র দল। অতএব ওদেরই অনুগ্রহ-প্রার্থী হয়ে থাকতে হল।

পাক্‌তেড়েটা ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ক'রে বসলো—কোন্ এক ভোটার তার কথা শুনবে না বলাতে সে তার মাথায় চাঁটা লাগালে, তারপর সেই ভোটারের বাড়ির গিন্নী বাইরে এসে ঝাঁটা নিয়ে তার ঘাড়ে সপাসপ্ দু' চার ঘা বসিয়ে দিলেন, পাক্‌তেড়ে অশ্রাব্য গাল শুরু করলে, তখন অপরাপর পার্টির লোকেদের ঝাল ঝাড়বার সুযোগ মিলে গেল, তারাও বেদম প্রহার শুরু করলে, এরপর সোডার বোতল, পটকা, ইঁট, পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি হয়ে গেল; তার শেষ ম্যাও সামলাতে হল গবাকে।

খড়কে এসে বললে, স্যার লীডার ধরা পড়ে গেছে, জামিনের বন্দোবস্ত করুন, উকিল দিন—হৈ হৈ ব্যাপার! ভোটারের লিষ্টি রইল পড়ে। একবার থানা, একবার আদালত এই ঘুরতে ঘুরতে আমি মাথা ঘুরে মরি আর কি! কারণ ভায়া সে ভারটা চাপালেন আমার ঘাড়ে।

বিকেলে সভা হবে, কিন্তু সেখানে গিয়েও ত ভ্যা ভ্যা ক'রে কাঁদবার অবস্থা। আশ্চর্য, কেউ সভা করতে দেবে না। বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী সবাইয়ের ঐ জায়গায় ঐক্য হয় —'মার বেটাকে'—এই ভাব। আমি তবু গ্রাহ্য করিনি—

খড়কেকে তুলে দিয়ে বললুম, তুই বলে যা। খড়কে বলবে কি, একটু তাকে খড়খড় করতেও দিলে না, বিপুযোয়ে চীৎকার ক'রে তাকে একেবারে বসিয়ে দিলে। গবা ত ব্যাপার দেখে হাবা। আমার তখন করুণা হল, নিজেই ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে শুরু করলুম—বন্ধুগণ, স্বাধীন ভারতের এই প্রথম নির্বাচনে আপনারা যদি এরকম আচরণ করেন, তাহ'লে ত আমাদের নির্বাচনপ্রার্থীকে সরে পড়তে হয়। কে একজন দূর থেকে বলে উঠলো, তাই পড়। আমি ক্ষেপে গেলুম, গলায় আরও জোর এনে বললুম, মশাই গো-চারণের মাঠেও যে কেউ এ রকম আচরণ করে না, গণতন্ত্র যে দেশে রয়েছে, ব্যক্তি স্বাধীনতা যেখানে রয়েছে, সেখানে আপনারা আমাদের কথা বলতে দেবেন না কেন? একজন আর এক দিক থেকে বলে উঠলো, কি আর নতুন কথা বলবে দাদা, বাহাত্তরজন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঐ একই কথা আগে বলে গেছে।

আমিও থামবার পাত্র নয় বলতে লাগলুম, বাহাত্তরজন যদি তাদের কথা বলার সুযোগ পায় তাহ'লে তিয়াত্তরজনের কথা কেন শুনবেন না? একজন ফুট কেটে বলে উঠলো ক্রমশ মাথা ধরে যাচ্ছে যে। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলুম, কিন্তু আমাদেরও যে মাথা ঘুরছে। একজন ভেংচু কেটে বলে উঠলো, তাই নাকি? আমিও প্রত্যুত্তরে ভেংচি-কেটে বলে উঠলুম, এজ্ঞে হ্যাঁ। তার উত্তরে আরও পাঁচজন ভেংচালে, শেষে তাই নিয়ে দু' পক্ষের আধ ঘণ্টা ধরে

ভেংচা ভেংচির কম্পিটিশন চললো—গবা বললে. দাদা চল এ জায়গায় সুবিধে হবে না, আবার হয়তো একটা পুলিস কেস হবে।

আমি তখন চুপ করলুম! মশাই, আশ্চর্য দেশের লোক —যারা আমাদের সমর্থক তারা একটা কথা কইলে না— সবাই দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগলো। অথচ এদেরই উপকারের জন্যে গবা দাঁড়িয়েছে। আমাদের ওয়ার্ডে আবার উনিশজন নির্বাচন প্রার্থী। -প্রত্যেকের এক কথা, দেশের ভাল করবো—কিন্তু ভালভাবে একটা মিটিং করতে যে দেশ দেয় না, সেখানে কি ভাল হবে তা ত বুঝতে পারি না।

তারপর মশাই টাকার ছেরাদ্দ! প্রত্যেকে হাত পেতে আছে। ক্লাবে চাঁদা দাও, বারোয়ারিতে দাও, স্পোর্টসে দাও হরিসভায় দাও, এমনি গাড়ি ভাড়ার জন্যে দাও, চায়ের জন্যে দাও, জলসার জন্যে দাও, তবে ভোট পাবে। তাও কি ঠিক ভোট দিয়ে আসবে—আসল দিনে একজনের টিকি দেখা যাবে না, ভোটাররা ঠিক—অন্য লোকের নামে টিক্ দিয়ে আসবে।

আমার ত ঘেন্না ধরে গেল। নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাওয়া সেও ত কঠিন ব্যাপার! তাও গলবস্ত্র হয়ে লোকের যাতে ভাল হয়, তার জন্যে গেছি। মশাই, ভদ্র-লোকরা যে এভাবে খিঁচুতে পারে, এও দেখলুম। কত রকম কথা—গবাক্ষ আবার কে মশাই? বিরূপাক্ষের ভাই.

—তাহ'লেই হয়েছে। দেশের কি কাজ তিনি করেছেন? বিধান সভায় গিয়ে একা তিনি কি বিধান দেবেন—যত সব চোরামি করার মতলব, যান্ যান্! একটা বুড়ো আবার অকারণে খিঁচিয়ে বলে উঠলো বেরো! মেরে মাথা ভেঙে দেবো! পাজী কোথাকার! আমি তবু কত বললুম, দেখুন, গবাক্ষ গেরস্থদের মনের কথা বলবে বলেই যাচ্ছে। উত্তর এল, ছাই কর্তে যাচ্ছে। নিজে রেস্ত করেনিয়েআরও চোস্ত ভাবে থাকবার

বন্দোবস্ত করতে যাচ্ছে সেটা আর আমরা বুঝি না? তা না হলে একটা দলের সঙ্গে তার মত মিললো না? সে একা কি করবে?

আমি বললুম, দেখুন চেঁচাতে ত পারবে? একজন পাশের বাড়ি থেকে বলে উঠলো, এখন একা চেঁচালে কাজ হয় না, কোরাসে চেঁচাতে পারেন, তবে যদি কিছু হয়!

আমি বললুম, ওকে যে কেউ নিলে না মশাই। একটি ভদ্রলোক বলে উঠলেন, ওঁর প্রোগ্রাম কি?

আমি তখুনি বলে যেতে লাগলুম, আজ্ঞে সেইটেই শুনুন

না। প্রথম—সমস্ত উদবাস্তুদের তিনি বাস্তু দেবেন, তার জন্যে যদি এখানকার লোকদের বাস্তুহারা করতে হয় তাতেও তিনি রাজী।

—তার মানে আমরা বিদেয় হব ?

—না, না, আপনারা কেন, মানে বড়লোকরা বিদেয় হবে। তারপর শুনুন দ্বিতীয় প্রোগ্রাম—সমস্ত বড়লোকদের গরীব করা হবে আর গরীবদের বড়লোক বানানো হবে। তৃতীয়—শ্রেণীহীন শোণিতহীনের একটা সমাজ গড়া হবে। চতুর্থ—প্রত্যেক লোককে চাকরি দেওয়া হবে, যারা চাকরি করছে তাদের সব তাড়াবো। পঞ্চম—প্রত্যেক লোককেএমন স্বাধীনতা দেওয়া হবেযে, যা-খুশী করতে পারবে কারুর বলবার কিচ্ছু থাকবে না। ষষ্ঠ—দেশে পুরুষ পুলিস উঠিয়ে দেওয়া হবে, শুধু নারী পুলিস রাখা হবে। সপ্তম—বাইরে থেকে খাদ্য আমদানি করা বন্ধ ক'রে দেওয়াহবে। প্রত্যেককে নিজে চাষ ক'রে খেতে হবে, যারা পারবে না তারা খাবি খাবে। অষ্টম—কৃষক ছাড়া আর কাউকে জমি দেওয়া হবে না। নবম—নারী পুরুষের ভেদাভেদ একদম বাতিল ক'রে দেওয়া হবে, ট্রেনে ট্রামে, গঙ্গার ঘাটে, সিনেমা, থিয়েটারে কোথাও 'স্ত্রীলোকদের জন্যে' কথাটা লেখা থাকবে না। দশম—কাউকে ইনকম ট্যাক্স দিতে হবে না। ১১শ—জাতি বর্ণ ধর্ম ভেদ থাকবে না, প্রত্যেক হিন্দুমুসলমানখৃষ্টানকে বাধ্যতামূলকভাবে পূজো, নেমাজ, প্রার্থনা করতে হবে। ১২শ—কাউকে কোন দিক দিয়ে ফাঁকতালায় সুযোগ সুবিধে উপভোগ করতে দেওয়া হবে না।

তিনি বললেন, এটা একটা প্রোগ্রাম ?

আমি বললুম, কেন নয় বলুন ? কংগ্রেস কম্যুনিস্ট, হিন্দু মহাসভা, জনসঙ্ঘ, কৃষক-মজদুর, সোস্যালিস্ট, আর সি পি আই, ইউ এস ও, ফরোয়ার্ড ব্লক, রামরাজ্য পরিষদ প্রত্যেকের ভাল ভাল জিনিস সংক্ষেপের মধ্যে গুছিয়ে প্রোগ্রাম তৈরী করা হয়েছে এতেও আপনি খুশী নন ?

তিনি আমায় হেসে বললেন, না ! এই জগা-খিচুড়ি প্রোগ্রামের সপক্ষে কেউ একটি টিক্‌ও দেবে না। বরং আমি আপনাকে বলছি, এর পরের বারে নামতে বলবেন গবাক্ষবাবুকে, কোন প্রোগ্রামের দরকার নেই শুধু মা শেতলাকে প্রতীক চিহ্ন ক'রে ভোট চাইবেন। হিন্দুর ছেলে কারুর সাহস হবে না ওঁর against-এ (বিরুদ্ধে) যায়—সবাই দলে দলে চোখ বুজে তাঁকেই ভোট দিয়ে আসবে।

গবাক্ষকে সেই কথা বলতে সে লাফিয়ে বলে

উঠলো, দি আইডিয়া। এবার দাদা সরে পড়ি—আসছে বারে মা শেতলাকেই এক্সপ্লয়েট্‌ করবো !

চরম জ্ঞান

মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে তাকে। জীবনের যেমন ছেদ নেই, তেমনি অভিজ্ঞতারও শেষ নেই। প্রতিদিন লক্ষ রকম আশাতীত, উদ্ভট ও বিচিত্র ঘটনা ঘটছে সবারই জীবনে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে, অতএব আর কত আলোচনা করা যায় বলুন? মৃত্যুর দিনেই বোধহয় মানুষের অভিজ্ঞতা অর্জনের শেষ তারিখ, কিন্তু সে অভিজ্ঞতাটুকু আর কাগজে কলমে লিখে যাবার অবকাশ কোন মানুষেরই কোনদিন হবে না। অতএব 'ক্রমশ' একটা থেকেই যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত, আমিও 'ক্রমশ' রেখেই বাকীটুকু আপনাদের ঠেকে শেখবার জন্যে রেখে বিদায় নিচ্ছি। সমস্ত অভিজ্ঞতা বলে ফেললে আপনারা আগে থেকে সাবধান হয়ে যাবেন হয়তো এবং দেশ তার বৈচিত্র্য হারাবে—অতএব মোটামুটি একটা সংক্ষিপ্তসার বলে আমার চরম অভিজ্ঞতাটুকু শুধু নিবেদন করে যাই শুনুন।

আসলে, পৃথিবীতে মানুষ নামক প্রাণীর শ্রেণীভুক্ত হয়ে আমি নিজের জাতটার স্বরূপ কিছুই বুঝতে পারলুম না। চতুষ্পদ হলে এদের যথার্থ আদর বা অনাদর কোন্‌টা তা হাবেভাবেই বুঝে ফেলতে পারতুম, এমনকি, বাঁদর হলেও কিছু

বোঝা যেত, কিন্তু চাদর গলায় দিয়ে আশপাশে নদর গদর করতে করতে যাঁরা মুখে সাদর আপ্যায়ন জানালেন, অথচ আড়ালে সঠিক সর্বনাশ ক'রে গেলেন—তাঁদের কিছুতেই ধরাছোঁয়া গেল না।

এই জাতের মধ্যে শতকরা আশিজন পাজী, দশজন হিঁসকুটে, পাঁচজন ফিচেল, চারজন সবকিছুর সমন্বয়, মাত্র একজন ভদ্রলোক, নিষ্ঠাবান, সত্যাশ্রয়ী—তাও তাঁরা বাইরে ঘোরেন না, দরজায় খিল এঁটে বসে থাকেন, কোন এক ফাঁকে ফোঁকর দিয়ে চেহারাটা দেখে নিতে হয়।

আমি নিজে কি, তা জানি না। কারণ নিজের বাইরের চেহারা আরশিতে দেখলে গালে চড় মারতে ইচ্ছে করে সত্যি, কিন্তু ভেতরের চেহারাটা কেমন, সেটা অপরে না দেখে এস্টিমেট দিলে বোঝা শক্ত। নিজের বিবেচনায় ভালই মনে হয়, অন্তত আপনাদেরই সামিল বলে ভেবে আরও ধোঁকায় পড়ে যাই।

পৃথিবীতে এসে আমার এইটুকু মোক্ষম অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, মানুষের অতিসান্নিধ্যে আসার চেয়ে দুঃখু আর নেই, তাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তাপসরা জীবনে কোনদিন লোকের দরজায় পাপোষের ওপরও দাঁড়াননি বা তক্তাপোষের ওপর বসেন নি, পাহাড়ের গুহার মধ্যে ঢুকে দিনের পর দিন উপোস করেও সুখে কাটিয়ে গেছেন। কারণ তাঁরা হাড়ে হাড়ে এই জীবটিকে চিনেছিলেন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য

তাহার উপরে নাই’ এই যে কথাটা চণ্ডীদাস বলে গেছেন না—এ খুব খাঁটি কথা, যেহেতু তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন যে, আর কোন প্রাণী মানুষের চেয়ে এককাঠি সরেশ হতে পারে না। এরকম একের নম্বরের হাড়হাবাতে জীব দেখা যায় না।

মশাই, লোকটাকে দেখলুম নিপাট ভালমানুষ, সাত চড়ে কথা কয় না, যেটুকু কয়, তাতে যেন মধু ঝরে, কারণে-অকারণে মৃদু মৃদু হাসে, দেখলে প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করে এমন ভাব, আমার চিরকালের ধারণা, লোকটি অতি সৎ, হঠাৎ এসে বললে, বড় ঠেকায় পড়ে গেছি ভাই, যদি শ’ পাঁচেক ধার দাও। তৎক্ষণাৎ পোস্টাফিসে মেয়ের বিয়ের জন্যে ছত্রিশ বছর ধরে যে ছশো টাকা জমিয়ে ছিলুম, তার থেকে তুলে এনে বিনা চিঠিতে পাঁচশোটি টাকা করকরে গুণে দিলুম। টাকা হাতে পেয়ে যে প্রশস্তি তিনি ক’রে গেলেন, তাতে মনে হল যে, এ সংসারে আমার চেয়ে ভাল লোক বোধহয় আর জন্মায় নি। ব্যস্!—তারপর তাঁর আর টিকি দেখা যায় না। মাসখানেক কড়ারে বছর খানেক পেরিয়ে গেল, তাঁর দুঃখের চাকা ঘুরে সুখ এল, গাড়ি হল, বাড়ি হল, সঙ্গে সঙ্গে ভুঁড়িও বাড়লো, ওদিকে আমার সব কমতে লাগলো, দেনার দায়ে নিজের বাড়ি ঘরদোর চলে গেল, কিন্তু তাঁকে আর নাগালের মধ্যে পেলুম না। পুরোনো টাকার তাগাদায় একদিন রাত্রে তাঁর বাড়ির বৈঠকখানায় ঢুকছিলুম, তিনি

ট্রেসপাসের চার্জে আলিপুরে আমার নামে একটি নালিশ ঠুকে দিয়ে বসে রইলেন। দ্বিতীয়—শুনলুম, ভদ্রলোক চরিত্রবান অর্থাৎ নিজের স্ত্রী ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোকের মুখের দিকে চান না—কিন্তু অপরের এক লক্ষ কেচ্ছার খবর রাখেন—তিনি উপর্যুপরি তিনটি স্ত্রী গত হতে সম্প্রতি চতুর্থে রত হয়েছেন, চরিত্র কোন ফাঁক দিয়ে ফসকাতে পারছে না।

তৃতীয়—ভদ্রলোক সাধু, চক্ষুলজ্জায় বাধ বাধ ঠেকে বলে এখনও সংসারে থেকে গেরুয়াটা নেননি, দিবারাত্র বাড়িতে হরিসংকীর্তন করান। শুনলুম, তেল, ঘি আর ওষুধের কারবার ক'রে ফেঁপে উঠেছেন। তিনবার মিউনিসিপ্যালিটি চারবার পুলিশ কারবারে হানা দেয়, কিন্তু শেষকালে সবাই না-না ইনি আমাদেরই মত লোক ভাল বলে সার্টিফিকেট দিয়ে চলে যায়।

চতুর্থ—ইনি সমাজ সংস্কারক উদারপন্থী, পণপ্রথার বিরোধী, অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী ব্রাহ্মণ সন্তান। বড় ছেলে এক বণিকের মেয়েকে বিয়ে করতে চায় শুনে তাকে বাড়িতে চিলে কোঠার ঘরে পুরে রাখলেন, চুপি চুপি চুপি শাসালেন যে, তেজ্যপুত্তুর করবো। এক জায়গায় বংশ, গোত্র, অর্থ সব কিছুর মিল হয়ে গেল, তিনি আগাম কিছু দাদনও নিলেন, কিন্তু ওদিকে খিল খুলে ছেলে পরদিনই রেজেস্টারী ক'রে এক হিল তোলা জুতো পরিয়ে বৌমাকে নিয়ে হাজির। তিনি ছেলেকে ত ভাগালেনই সঙ্গে সঙ্গে যারা বায়না দিয়ে গেছলো

তাদেরও। স্রেফ বলে দিলেন, এ বিয়ের সম্বন্ধে আমি কিচ্ছু জানি না, তোমরা কি দিয়েছ না দিয়েছ, তা আমার মনেও নেই! গোলমালে দরকার নেই—আদালত আছে যাও।

পঞ্চম—আর একজন অতি সংযমী, কোন এক কলেজের অধ্যাপক। একুশটি ছেলেমেয়ের বাবা, দু'শো টাকা মাইনে পান। আগে ক্যাপিট্যালিস্টদের দারুণ সমর্থক ছিলেন, গুটি পাঁচেক মেয়ে হবার পর সোস্যালিস্ট হন, এখন শুধু লাল ঝাণ্ডা ছাড়া আর কথা নেই—কারণ বুঝেছেন যে, এতগুলোকে তাহ'লে ভবিষ্যতে সামলাবে কে? কিন্তু তারাও শেষ পর্যন্ত এঁর সঙ্গে তাল রাখতে অপারগ হলে যে কি হবে সেটা ভেবে দেখেন না।

ষষ্ঠ—ভদ্রলোক অতি চাপা, গম্ভীর প্রকৃতির। সবার সঙ্গেই সহৃদয় ব্যবহার। বিশ্বাস ক'রে রাম শ্যামের সম্বন্ধে এমনি কতকগুলি মন্তব্য করে, বলা বাহুল্য রাম ও শ্যাম বিশেষ বন্ধু। ভদ্রলোক তার পরদিনই শ্যামকে ডেকে রামের কথার ওপর তিন পোঁচ রং চাপিয়ে তাকে অনেক কিছু বলে গেলেন। তার উত্তরে আবার শ্যাম রাম সম্বন্ধে আরও বহু কথা বলে গেল, তিনি তার ঘণ্টা খানেক বাদেই টেলিফোনে সেগুলিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রামের কর্ণকুহর শীতল করালেন। সাত-দিনের মধ্যে উভয়ের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল—ইনি তখন সকলের কাছেই ব্যাপারটা যে কত বড় দুঃখের তা প্রচার ক'রে বেড়াতে লাগলেন।

সপ্তম—উনি দেশের নেতা। বিশ্বাস ক'রে দেশের উপকারের জন্যে মিটিংয়ে চাঁদা চাইলেন, হাঁদার মত পরিবারের চুড়ি খুলে বাহাদুরী দেখিয়ে এলুম কিন্তু তারপর দেখলুম তিনিতুড়ী দিয়ে সেগুলোকে কি রকম ম্যাজিকের মত উড়িয়ে দিলেন, আর আমরা উপকারের ঠেলায় ভুঁয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগলুম।

অষ্টম—অতি অমায়িক সজ্জন ভেবে এঁকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একে বারে আত্মীয় ক'রে নিলুম, বছর খানেক পর থেকে বই, ব্যাগ, ঘড়ি, চুড়ি সব সরতে শুরু করলো। বলারও জো নেই এত বেমালুম সরাচ্ছেন, শেষে পাশের বাড়ির এক মুখপুড়ীর সঙ্গে তিনি নিজেই সরলেন, আমরাও বাঁচলুম।

এই সব স্যাম্পেল দেখে শুনেও কি মানুষ জাতটার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারা যায়? সারল্য, আন্তরিকতা, বিশ্বাস, সততা সমস্ত পৃথিবী থেকে পালিয়েছে। খৃষ্ট পূর্ব চল্লিশ হাজার বছরে হয়তো ওগুলো ছিল, কিন্তু এখন নেই, যাই বলুন না কেন। একেবারে নেই বলছি না, কিন্তু উর্দ্ধে

দেবলোক থেকে এগুলোকে যে-ভাবে এখন কণ্ট্রোল করে ছাড়া হচ্ছে, তাতে বেঁচে থাকা চলে না। পৃথিবীর কোন্ কোন্ মানুষের হৃদয় কন্দরে এগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে তা জানতে গেলে রীতিমত গবেষণা করতে হয়: সারাদিন খেটেখুটে এ সব মশাই, আর পোষায় না। অথচ ওপর—ওপর কারুকে বোঝবার জো নেই। মুখে এক, কাজে বিপরীত এই ত বেশি। তাহ'লে কার প্রতি আস্থা স্থাপন করবো ?

বিজ্ঞাপনের জোরে বাজারে ভেজাল ঘি চলে, ওষুধ চলে, কিন্তু মানুষও চলে। প্রচার যার দুনিয়া তার, এইটেই এ যুগের স্লোগান। কেউ ভেতরে কতখানি খাঁটি মাল আছে তা দেখতে যাবে না যাচাই ক'রে, শুধু উত্তেজনার খোরাক জুগিয়ে যারা যাচ্ছে তাদেরই কেল্লা ফতে।

ভাল লোক যাঁরা আছেন তাঁরা কোথায় থাকেন যদি দয়া ক'রে আমায় তাঁদের ঠিকানাগুলো দিয়ে দেন তাহ'লে অন্তত একবার চর্মচক্ষে দেখে আসি। আমার দুর্ভাগ্য সে রকম আঁটি—আঁটি লোকের সংস্পর্শে আমি খুব কমই এসেছি—যত পেঁচোয়া, পাজী, হাড়হাবাতে মিচ্‌কে, আমার বরাতেই জুটেছে চতুর্দিকে, ছোঁয়াচ হয়তো আমাকেও লেগেছে কিন্তু আপনাদের সেই সংক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্যে কয়েকটি নিদারুণ অভিজ্ঞতা বলে গেলুম। সে জন্যে গাল দিতে হয় দিন, হাততালি দিতে চান দিতে পারেন—কোন কিছুতেই আপত্তি জানাবো না!

আপনাদের গালাগালি ও হাততালি উভয়কেই বরণ ক'রে নিয়ে আমি বিদায় হচ্ছি। আমার অভিজ্ঞতায় অনেকের স্বরূপ ফুটে উঠেছে, ভবিষ্যতে তাদেরই আবার নবরূপ দেখতে পেলে টেনে সামনে নিয়ে আসবো। আর যদি তার আগে আপনারা নিজেরাই স্বীয় অভিজ্ঞতার জোরে তাড়াতাড়ি এদের সবাইকে চিনে ফেলেন তাহ'লে ত আমাকে আর কোন দিন চেল্লাতে আসতেই হবে না।